গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আর্সেনিক দূষণ নিরসন
প্রশিক্ষণ সহায়িকা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

ডিপিএইচই এর প্রকাশনা

জুন ২০১৭

আর্সেনিক দূষণ নিরসন প্রশিক্ষণ সহায়িকা

প্রকাশক
গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহায়তা
আর্সেনিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

আর্সেনিক দূষণ নিরসন প্রশিক্ষণ সহায়িকা

অনুসরণ
আর্সেনিক দূষণ নিরসন কার্যক্রম, ট্রেনিং ম্যানুয়াল, ১৯৯৮
আর্সেনিক দূষণ নিরসন কার্যক্রম প্রকল্প
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ, পরিকল্পনা, অভ্যন্তরীণ চিত্র ও সার্বিক তত্ত্বাবধান
আর্সেনিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রাপ্তিস্থান
আর্সেনিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি,
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

সহায়িকাটি কপিরাইট প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত। এর যে কোন অংশ ছাপানো যাবে
তবে সূত্র উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

সূচী

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য	৫
বিষয়বস্তু-১ ঃ আর্সেনিক দূষণ ও এর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য	৭
বিষয়বস্তু-২ ঃ ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক সংমিশ্রণ, মানবদেহে আর্সেনিক এর লক্ষণ সমূহ, প্রতিক্রিয়া ও আর্সেনিক দূষণ রোধে করণীয়	১৩
বিষয়বস্তু-৩ ঃ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয়	২৪
বিষয়বস্তু-৪ ঃ আর্সেনিক দূষণ ও এর প্রতিরোধ সম্পর্কে গণসচেতনতা, যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণ	৩০

প্রশিক্ষণ সিডিউল ঃ

সময়	বিষয়	প্রশিক্ষক
০৯:০০-০৯:৩০	রেজিষ্ট্রেশন	
০৯:৩০-১০:১৫	প্রশিক্ষণ উদ্বোধন, পরিচিতি পর্ব ও চা-চক্র।	
১০:১৫-১০:৪০	প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রত্যাশা তালিকাভূক্ত করণ এবং এ বিষয়ে আলোচনা।	
১০:৪০-১০:৪৫	বিরতি	
১০:৪৫-১১:৩০	বিষয়বস্তু-১ ঃ আর্সেনিক দূষণ ও এর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য।	
১১:৩০-০১:০০	বিষয়বস্তু-২ ঃ ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক সংমিশ্রণ, মানবদেহে আর্সেনিক এর লক্ষণ সমূহ, প্রতিক্রিয়া ও আর্সেনিক দূষণ রোধে করণীয়।	
০১:০০-০২:০০	দুপুরের বিরতি (খাবার ও নামাজ আদায়)।	
০২:০০-০৪:৩০	বিষয়বস্তু-৩ ঃ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয়।	
০৪:৩০-০৪:৫০	বিষয়বস্তু-৪ ঃ আর্সেনিক দূষণ ও এর প্রতিরোধ সম্পর্কে গণসচেতনতা, যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণ।	
০৪:৫০-০৫:০০	সমগ্র দিনের আলোচনা সংক্ষেপে পুনারাবৃত্তি এবং দিনের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা।	

প্রশিক্ষণ উদ্বোধন ও পরিচিতি পর্ব ঃ

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য ঃ

নব্বই এর দশকে বাংলাদেশে যখন ভূ-গর্ভস্থ পানি নিরাপদ খাবার পানি হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে এইসময় আর্সেনিকের উপস্থিতি প্রথম পরিলক্ষিত হয় ১৯৯০ এর দশকে (১৯৯৩ সালে চাপাইনবাবগঞ্জে)। খাবার পানি আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত হবে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় মানুষের শরীরে গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিবে তা প্রথমদিকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি [১]। আমাদের দেশে যে সময়ে নিরাপদ পানি ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম হিসাবে দেখা দেয় এবং তার সহজপ্রাপ্যতা অগভীর নলকূপের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে যাচ্ছিল ঠিক সে সময়ে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ এক ভয়াবহ হুমকির সৃষ্টি করে। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ ইতিপূর্বে বিশ্বের কয়েকটি দেশে যেমন, তাইওয়ান, আর্জেন্টিনা, আলাস্কা, চিলি, ঘানা, হাঙ্গেরিতে দেখা দিয়েছিল কিন্তু আমাদের দেশের মত ব্যাপকভাবে পানিতে দূষণ হয়নি এবং এরকম বিপুল জনগোষ্ঠি হুমকির সম্মুখীন হয়নি।

জনস্বাস্থ্যের এই নতুন এবং ভয়াবহ সমস্যাকে মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন জনস্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে সংশ্লিষ্ট সকলকে আর্সেনিক বিষয়ে পূর্ণ ধারণা প্রদান করা। বাংলাদেশে বিভিন্ন সংস্থা আর্সেনিক দূষণ নিরসন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রয়েছে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে কর্মকান্ড পরিচালনাকারীর অনেকেরই আর্সেনিক ও আর্সেনিক দূষণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় তারা আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে পারছে না। তাছাড়া এ রোগের লক্ষণ সমূহ সম্পর্কে চিকিৎসক এবং সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে অবহিত নয় ফলে রোগী সনাক্ত করাও সম্ভব হয়ে উঠছে না।

আর্সেনিক দূষণ নিরসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয় এবং রোগী সনাক্ত করা, এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ ও নিশ্চিত প্রয়োগের জন্য প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। সঠিক প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিষয় ও প্রয়োগ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করে এবং কার্যক্রমকে সফল করে।

বিষয়বস্তু ভিত্তিক উদ্দেশ্য ঃ

(ক) অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নলিখিত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন

১। আর্সেনিক কি এবং এর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য;
২। ভূ-গর্ভের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতির কারণ;
৩। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় আর্সেনিক দূষণ পরিস্থিতি;
৪। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্সেনিক দূষণের অবস্থান;
৫। মানবদেহে আর্সেনিক দূষণের প্রতিক্রিয়া;
৬। আর্সেনিক দূষণ থেকে প্রতিকার;
৭। আর্সেনিক আক্রান্তের প্রতি করণীয়।

(খ) অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নলিখিত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন

১। ফিল্ড কিট পদ্ধতিতে পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয় ;
২। আর্সেনিকোসিসের ঝুঁকির মধ্যে থাকা রোগীদের প্রাথমিকভাবে সনাক্তকরণ;
৩। জনসচেতনতা সৃষ্টি;
৪। আর্সেনিক সংক্রান্ত জরীপ পরিচালনা।

(গ) অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে মনোভাব সৃষ্টি হবে

১। আর্সেনিক দূষণ নিরসন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়া;
২। জনগণের সঙ্গে একাত্মতা সৃষ্টি;
৩। কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি;
৪। দলীয়ভাবে কাজ করা।

সেশনের উদ্দেশ্য ঃ

এই সেশনে অংশগ্রহণকারীগণ
- একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারবেন,
- জড়তা কাটিয়ে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারবেন,
- প্রশিক্ষণে নিজের প্রত্যাশা ব্যক্ত করতে পারবেন,
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন,
- প্রশিক্ষণের নিয়মকানুন অনুসরণ করে প্রশিক্ষণটি সার্থক করে তুলতে সচেষ্ট হবেন।

উপকরণঃ হোয়াইটবোর্ড, হোয়াইটবোর্ড মার্কার, ফ্লিপ চার্ট বোর্ড, ফ্লিপ চার্ট পেপার, ফ্লিপ চার্ট মার্কার, ভিপ (VIPP) কার্ড, সাদা কাগজ, OHP, ট্রান্সপারেন্সি, জড়তা ভঙ্গনের (Ice Breaking) জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, ডাষ্টার ।

সময়কাল ঃ ৪৫ মিনিট

পরিচালন প্রক্রিয়া ঃ

বিষয়	কার্যক্রম
প্রশিক্ষণ উদ্বোধন ঃ	ভূমিকা, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য উপস্থাপন, বক্তব্যের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করা ।
পরিচিতি ও জড়তা ভঙ্গন ঃ	ফ্লিপ চার্ট, ভিপ (VIPP) কার্ড ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করে প্রশিক্ষণার্থীদের জড়তা ভেঙ্গে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া।
প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশা ঃ	ভিপ (VIPP) কার্ড, কাগজ ব্যবহার করে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশা উপস্থাপন করা।
প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ উপস্থাপন ঃ	OHP, ফ্লিপ চার্টের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ উপস্থাপন এবং বর্ণনা করা।
প্রশিক্ষণের নিয়মকানুন অনুসরণ ঃ	প্রশিক্ষণটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য যে বিষয়গুলো সকলকে মেনে চলা উচিত তা প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে ফ্লিপ চার্টে লিপিবদ্ধ করে শ্রেণী কক্ষের সুবিধাজনক স্থানে টাঙিয়ে রাখতে হবে যেন সকলেই তা দেখতে পায়।

বিষয়বস্তু-১ ঃ আর্সেনিক দূষণ ও এর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য	ঃ	এই বিষয়বস্তু আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বর্ণনা করতে/বলতে সক্ষম হবেন ঃ- ● বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্সেনিক দূষণের অবস্থা ● বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আর্সেনিক দূষণের চিত্র ● আর্সেনিকের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ● পরিবেশে আর্সেনিকের উপস্থিতি ● আর্সেনিকের ব্যবহার
সময়কাল	ঃ	৪৫ মিনিট
উপকরণ	ঃ	হোয়াইটবোর্ড, হোয়াইটবোর্ড মার্কার, ফ্লিপ চার্ট বোর্ড, ফ্লিপ চার্ট পেপার, ফ্লিপ চার্ট মার্কার, ভিপ (VIPP) কার্ড, সাদা কাগজ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, OHP, ট্রান্সপারেন্সি, ডাষ্টার, ম্যানুয়াল।

পরিচালন প্রক্রিয়া ঃ

বিষয়		কার্যক্রম
বিষয়বস্তুর নাম ও উদ্দেশ্য	ঃ	বিষয়বস্তুর নাম লিখিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এই বিষয়বস্তু থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা কি শিখতে চায় তা প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিতে হবে । পূর্বে লিখিত নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ উপস্থাপন করতে হবে।
আলোচনা	ঃ	প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে। প্রশ্ন অংশগ্রহণকারীকে আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে । খেয়াল রাখতে হবে পদ্ধতিগতভাবে প্রশ্ন উপস্থাপন করা হচ্ছে কি না? অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু ফ্লিপ চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে।
বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ	ঃ	আলোচনা শেষে পুরো অধ্যায় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হবে।
মূল্যায়ন	ঃ	প্রশ্ন উপস্থাপন এবং উত্তর প্রদানের মধ্য দিয়ে অধ্যায়টি অংশগ্রহণকারীরা কতটুকু জেনেছে তা মূল্যায়ন করতে হবে।

১.১ আর্সেনিক দূষণ ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ বহুমুখী প্রাকৃতিক দুর্যোগে কবলিত একটি দেশ। প্রায় ১৬ কোটি মানুষের এই দেশটি প্রায়শঃ বন্যা, খরা, কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এসব দুর্যোগের সঙ্গে যোগ হয়েছে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণের মতো ভয়াবহ বিষয়টি। নলকূপের ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ ৯৭% এ উন্নীত হয়েছিল বলে যে সামাজিক সূচকটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের কারণ ছিল, অগভীর নলকূপে আর্সেনিক সনাক্ত হওয়ার পর ২০০৩ সালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সমীক্ষায় কভারেজের হার ৭৪% এ নেমে যায়। দেশের মধ্য এবং মধ্যপূর্ব এলাকায় আর্সেনিকের প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রধানত: ৫০-১৫০ ফুট গভীরতার নলকূপের (যা অগভীর নলকূপ হিসাবে চিহ্নিত) পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতির হার বেশি। এসব নলকূপের পানির সঙ্গে ভূ-গর্ভ থেকে উঠে আসে আর্সেনিক নামের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থটিও [১]।

আর্সেনিক দূষণের উপর পরিচালিত সর্বশেষ ২০১২ সালে পরিচালিত বহু নির্দেশক গুচ্ছ জরিপ (Multiple Indicator Cluster Survey) এর তথ্য মতে দেশে মোট ১ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ অতিরিক্ত আর্সেনিক দূষণের ঝুঁকির মধ্যে বাস করছেন। বর্তমানে দেশে আর্সেনিক দূষণের হার প্রায় ১২% [২]। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্সেনিক দূষণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম আর্সেনিক দুর্যোগ কবলিত দেশ। দেশটির একটি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে আর্সেনিক দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে। আর এই দূষণ এখানে শুধু বড় ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যাই তৈরি করেনি, সামাজিক সম্পর্ক এবং পরিবেশকেও সংকটগ্রস্ত করেছে।

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আর্সেনিক দূষণের ঘটনা ধরা পড়ে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নিয়োজিত সরকারি সংস্থা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলায় পরীক্ষা চালিয়ে নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণ সনাক্ত করে। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত সর্বশেষ জরিপগুলোতে দেখা গেছে, দেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে অন্ততঃ ৪৬ টিতে আর্সেনিক দূষণ ঘটেছে। এসব জেলায় নলকূপের পানিতে পাওয়া গেছে গ্রহণযোগ্য মাত্রার (০.০৫ মিঃগ্রাঃ/লিঃ) চেয়েও অনেক বেশি আর্সেনিক।

২০০১ সালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভে (বিজিএস) এর যৌথ উদ্যোগে সারা দেশে পরিচালিত নমুনা সমীক্ষায় ২৭% অগভীর নলকূপে আর্সেনিকের উপস্থিতি পাওয়া যায়। ২০০৩ সালে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সরকারী বেসরকারী ৪৫ লক্ষ অগভীর নলকূপ স্ক্রিনিং এ ২৯%এ আর্সেনিকের উপস্থিতি পাওয়া যায়। সারাদেশের ভিত্তিতে এ হার ২৩%। এ স্ক্রিনিং এ ৩৮ হাজার আর্সেনিক রোগী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক চিহ্নিত হয় [১]।

পরীক্ষিত নমুনা বিশ্লেষণ করে নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণের পরিমাণের ভিত্তিতে অধিক দূষণযুক্ত, কম দূষণযুক্ত ও দূষণমুক্ত জেলায় চিহ্নিত করা হয়। নিম্নে ক্ষতিগ্রস্থতার শ্রেণী বিন্যাস হিসাবে জেলাগুলোর তালিকা তুলে ধরা হলো।

অধিক দূষণযুক্ত জেলাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, চাপাইনবাবগঞ্জ, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, যশোর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়া, নারায়নগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী, খুলনা, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বরিশাল এবং পিরোজপুর।

কম দূষণযুক্ত জেলাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, জামালপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর ও চট্টগ্রাম।

দূষণমুক্ত হিসেবে পাওয়া যায় পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, রংপুর, জয়পুরহাট, বগুড়া, নওগাঁ, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও গাজীপুর জেলাকে।

পরবর্তীতে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার এই ৪টি জেলা ব্যতীত ৬০টি জেলায় আর্সেনিকে আক্রান্ত হিসেবে ধরা পড়ে।

নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অগভীর নলকূপে দেখা যায়। গভীর নলকূপে আর্সেনিকের উপস্থিতি তুলনামূলক কম। ২০০৯ সালে দেশব্যাপী পরিচালিত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও জাইকা এর যৌথ সমীক্ষার প্রতিবেদনে আর্সেনিক দূষণ ব্যাপ্তির দিক থেকে ১৮৭টি ইউনিয়নকে অতি উচ্চ অগ্রাধিকার, ২১৫টি ইউনিয়নকে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় [৩]।

গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক পানির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে গ্রহণ করলে ধীরে ধীরে বিষক্রিয়ায় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আক্রান্ত হয়। ২০১৬ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব মতে দেশে মোট ৬৫,৯১০ জন মানুষ আর্সেনিকোসিস রোগে আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে [৪]। তবে আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত হয়ে কত লোক এ যাবত মারা গেছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই।

১.২ আর্সেনিক ঃ বিশ্ব পরিস্থিতি

বিংশ শতকের শুরু থেকেই বিভিন্ন সময়ে দেশ আর্সেনিক দূষণ সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে। এশিয়ার অনেক দেশে, ল্যাটিন আমেরিকায়, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-গর্ভস্থ পানিতেও আর্সেনিক দূষণ ঘটেছে। মূলত খাবার ও সেচের জন্য অধিক পরিমাণে ভূ-গর্ভস্থ পানি তোলা হয়েছে অধিকহারে এমন দেশগুলোতেই আর্সেনিক দূষণ ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই অনেক দেশ আর্সেনিক সমস্যা দূর করতে পেরেছে। নিচে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্সেনিক সমস্যা তুলে ধরা হলো।

১.২.১ *আর্জেন্টিনাঃ* বিংশ শতকের শুরুতে, সম্ভবত বিশ্বে আর্জেন্টিনাতেই প্রথম টানিতে আর্সেনিক দূষণ ধরা পড়ে। ১৯৩৮ সালে আর্জেন্টিনায় আর্সেনিক নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। আর্সেনিকজনিত রোগ আর্জেন্টিনায় পরিচিতি পায় 'বেল ভিল রোগ' হিসেবে। পূর্ব ও মধ্য আর্জেন্টিনার প্রতি লিটার পানিতে ০.১-২.০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত আর্সেনিক পাওয়া যায়। আর্জেন্টিনার পানিতে আর্সেনিকের উৎস হিসেবে মাটির গঠনকে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া প্রাকৃতিকভাবেও ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়। তবে আর্জেন্টিনায় ভূ-পৃষ্ঠের পানি বা ভূ-গর্ভের গভীরতর স্তরের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া যায়নি বা গেলেও তার মাত্রা ছিল খুব কম। আর্জেন্টিনার ২০ হাজারের মত মানুষ আর্সেনিকজনিত রোগে ভুগছিল, আক্রান্তের সংখ্যা কম হওয়ায় ও প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ায় আর্সেনিক সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারেনি [১]। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০৩ সালের হিসাব মতে আর্জেন্টিনাতে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন অধিবাসী বেশি মাত্রার আর্সেনিকে আক্রান্ত [৫]।

১.২.২ ***মেক্সিকোঃ*** উত্তর মেক্সিকোর ১১টি কাউন্টির ১ লাখ ২৭ হাজার মানুষ আর্সেনিক ঝুঁকির আওতায় আসে। এসব কাউন্টিতে প্রথমে প্রতি লিটার পানিতে ০.১-০.৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়ে। আর্সেনিক দূষিত পানি পান করায় এখানকার মানুষ ক্যান্সারসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত হয় [১]।

১.২.৩ ***চিলিঃ*** ১৯৫৭ সালে প্রথম চিলির একটি প্রদেশের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি টের পাওয়া গেলেও আর্সেনিকোসিসের প্রথম রোগীর সন্ধান মেলে ১৯৬২ সালে। এরপর থেকে বিভিন্ন গবেষণায় এ প্রদেশের মানুষের দেহে আর্সেনিকজনিত প্রায় সব রোগেরই সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৫৭ সালের পর থেকে এক যুগেরও বেশি সময় এ প্রদেশের মানুষ ০.৮-১.৩ মিগ্রা/লিটার মাত্রার আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করেছে। ১৯৭০ সালে একটি আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানোর মাধ্যমে পানিতে আর্সেনিক দূষণের মাত্রা ০.৪ মিগ্রা/লিটার-এর নিচে নামিয়ে আনা হয়। কিন্তু ১৯৫৭ সাল থেকে আর্সেনিক দূষিত পানি পান করার ফলে পরবর্তী সময়ে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৯৮৯-৯৩ পর্যন্ত চিলিতে যত মানুষ মারা গেছে তার শতকরা ৭ ভাগের ঘাতক হিসেবে আর্সেনিককে চিহ্নিত করা হয়েছে [১]। বর্তমানে চিলিতে জনসংখ্যার ১২% আর্সেনিকে আক্রান্ত অঞ্চলে বসবাস করে [৬]।

১.২.৪ ***আমেরিকাঃ*** খুব কম মাত্রায় হলেও প্রায় সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। দেশটির ৩০ লাখ লোক আর্সেনিক দূষিত পানি পান করছে। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি কাউন্টির পানিতে ০.০৪৫ মিগ্রা/লিটার এবং নেভাডার দুটি কাউন্টিতে ০.০৯২ মিগ্রা/লিটার আর্সেনিক পাওয়া গেছে। ১৯৭২-৮২ সালের মধ্যে পরিচালিত এক সমীক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের ত্বক ও স্নায়ু রোগের সঙ্গে আর্সেনিকের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে [১]। সম্প্রতি পরিচালিত অপর এক গবেষণায় স্বল্পমাত্রায় আর্সেনিক গ্রহণের ফলে মূত্রথলির ক্যান্সার হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। Natural Resources Defense Council (NRDC) এর ২০০০ সালের তথ্য মতে ৩৪ মিলিয়নের অধিক আধিবাসী আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করে।

১.২.৫ ***তাইওয়ানঃ*** তাইওয়ানে আর্সেনিক দূষণ প্রথম ধরা পড়ে ১৯৫৮ সালে। এখানে 'ব্ল্যাক ফুট ডিজিজ' নামে এক ধরনের রোগের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। পরে গবেষণায় জানা যায়, এ রোগের উৎস আর্সেনিক এবং আর্সেনিকের উৎস নলকূপের পানি। দেশটির ৮৩ হাজার নলকূপের পানি পরীক্ষা করে ১৯ ভাগ নলকূপে ০.০৫ মিগ্রা/লিটার মাত্রার আর্সেনিক পাওয়া গেছে। পরে পানি বিশুদ্ধ করার প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়। ১৯৭৯ সালের মধ্যে এ প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৯০ ভাগ এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়। তবে দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করায় এখনও "ব্ল্যাক ফুট ডিজিজ" -এ আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে প্রায় ১ লাখ লোক আর্সেনিকজনিত সমস্যায় ভুগছে [১]। দীর্ঘ দিনের জরীপ থেকে দেখা যায় যে, দক্ষিণ তাইওয়ানের ভূ-গর্ভস্থ পানির ২০% আর্সেনিকযুক্ত এবং এর ফলে ঐ অঞ্চলের অর্ধেকের বেশি অধিবাসী আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করে স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে আছে [৭]।

১.২.৬ ***চীনঃ*** ১৯৫৩ সালের চীনের একটি প্রদেশে প্রথম আর্সেনিক দূষণ রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৬৪ সাল থেকে চীনের বিভিন্ন এলাকায় মেডিক্যাল সার্ভে শুরু হয়। ১৯৯২ সালে প্রায় ৩০০ জন আর্সেনিক রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৯১-৯৩ পর্যন্ত পরিচালিত অপর এক জরিপে ৯ হাজার ২০২ জনকে পরীক্ষা করে ১ হাজার ৫৪৬ জনকে আর্সেনিকজনিত রোগে আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এদের মধ্যে ৮৮ ভাগ খাবার থেকে, ৫ ভাগ বাতাস থেকে এবং ৭ ভাগ মানুষ খাবার পানি থেকে আক্রান্ত হয়েছে। জ্বালানী হিসেবে কয়লার ব্যবহারই আর্সেনিক দূষণের কারণ বলে জানা যায়। কিছু কিছু কয়লায় উচ্চ মাত্রার আর্সেনিক থাকে। চীনে আর্সেনিক দূষণের পাশাপাশি ফ্লুরাইড দূষণেরও খবর পাওয়া গেছে [১]। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা যায় যে, চীনের প্রায় ১৯ মিলিয়ন জনগণ ০.০১ মিগ্রা/লি. এর বেশি মাত্রার আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করে স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করছে [৮]।

১.২.৭ ***ভারতঃ*** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি ভারতে তুলনামূলক অধিক হারে আর্সেনিক আক্রান্ত রাজ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলার মধ্যে ৯টি জেলা আর্সেনিক পীড়িত। আর্সেনিক আক্রান্ত জনসংখ্যা ৪.২৭ কোটি। ভারতের চন্ডীগড়ে ১৯৭৬ সালে পানীয় জলে বিপজ্জনক মাত্রার আর্সেনিক দূষণ ধরা পড়ে। কিন্তু এই দূষণ থেকে মানুষের শরীরে কী মারাত্মক রোগ দানা বাঁধে সেটা জানা যায় ১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গের, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, শুধু উত্তর ২৪ পরগনা ছাড়াও মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভূ-গর্ভস্থ পানি অধিক মাত্রার আর্সেনিকে আক্রান্ত [৯]। এ সময়ে জানা যায়, আর্সেনিক দূষণের ফলে চামড়ার ক্যান্সারসহ নানা ধরনের রোগ দেখা দিচ্ছে এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটছে। এর পর কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের আরও তিন জেলায় পানীয় জলে বিপজ্জনক মাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়ে, দূষণ ছড়িয়ে পড়ে বিহার, উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খন্ড, আসাম সহ কয়েকটি রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষজ্ঞদের মতে, পানিতে আর্সেনিকের উৎস ভূ-তাত্ত্বিক এবং নির্বিচারে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে সৃষ্টি। বিভিন্ন ভূ-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কারণে পানিতে আর্সেনিক দ্রবীভূত হচ্ছে [৯]।

১.৩ আর্সেনিক ঃ রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

আর্সেনিক স্ফটিকাকার একটি ধাতব মৌল, যা ভঙ্গুর এবং ফিকে ধূসর বা সাদা বর্ণের হতে পারে। পিরিয়ডিক চার্টে এর অবস্থান ৫ নম্বর গ্রুপে, আণবিক সংখ্যা ৩৩ এবং আণবিক ওজন ৭৪.৯২। প্রকৃতিতে আর্সেনিক মুক্ত মৌল হিসেবে সাধারণত পাওয়া যায় না। এটি সর্বদাই রাসায়নিকভাবে কোন না কোন মৌল বস্তুর সঙ্গে যৌগরূপে বিরাজমান। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এটি খুবই সক্রিয় একটি মৌলিক পদার্থ এবং খুব সহজেই অন্য পদার্থের সঙ্গে বন্ধন তৈরি করতে

পারে। একদিকে অক্সিজেন, ক্লোরিন, গন্ধক, কার্বন, হাইড্রোজেন, অন্যদিকে সীসা, পারদ, সোনা, লোহার সঙ্গে যৌগরূপে আর্সেনিক অবস্থান করে প্রকৃতিতে আর্সেনিক প্রধানত অক্সাইড, হাইড্রোজেন, সালফাইড, আর্সেনাইট এবং আর্সেনেট যৌগ হিসেবে বিদ্যমান।

পৃথিবীতে ১৫০টির মত আর্সেনিক যৌগের উপস্থিতির কথা জানা যায়। তবে মূলত তিনটি খনিজ পদার্থকে আর্সেনিকের আকর হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ এদের মধ্যে আর্সেনিকের পরিমাণ যেমন বেশি তেমনি এগুলো অনেক বেশি সহজলভ্য। এই তিনটি খনিজ হচ্ছেঃ রিয়ালগার (Realger) বা আর্সেনিক সালফাইড (AsS), অরপিমেন্ট (Orpiment) বা আর্সেনিক ট্রাই সালফাইড (As_2S_3) এবং আর্সেনোপাইরাইট বা আয়রন আর্সেনিক সালফাইড (FeAsS)। এই তিন ধরনের আর্সেনিক খনিজের ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সবগুলোতেই রসুনের গন্ধের মতো একটা গন্ধ পাওয়া যায়। পানিতে আর্সেনিক দ্রবীভূত হওয়ার পর এই পানিতে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। আর্সেনিকে বাতাসে পোড়ালে রসুনের মত গন্ধ পাওয়া যায় এবং আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইডের (As_2O_3) ঘন সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় [১]।

এক নজরে আর্সেনিক

প্রতীক	অং
আনবিক সংখ্যা	৩৩
পর্যায় সারণীতে আণবিক ওজন	৭৪.৯২১৬
পর্যায় সারণীতে অবস্থান	VA
ঘনত্ব (৩২° ফাঃ)	৫.৭৩
স্ফুটনাঙ্ক	১,১৩৯° ফাঃ
গলনাঙ্ক	১,৪৯৭.২° ফাঃ

রাসায়নিকভাবে আর্সেনিক যৌগগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হচ্ছে ঃ অজৈব আর্সেনিক ও জৈব আর্সেনিক। অজৈব আর্সেনিক যৌগগুলো আবার দুই ধরনের হতে পারে– ত্রিযোজী (Pentavalent) আর্সেনিক এবং (Trivalent) আর্সেনিক। অজৈব আর্সেনিক যৌগ জৈব আর্সেনিকের চেয়ে বেশি বিষাক্ত। বিষক্রিয়ার মাত্রা অনুযায়ী আর্সেনিকের বিভিন্ন অবস্থাকে পরপর নিম্নরূপে সাজানো হলো ঃ

(১) আর্সাইন গ্যাস (A_2H_3)
(২) অজৈব ত্রিযোজী আর্সেনিক যৌগ
(৩) জৈব ত্রিযোজী আর্সেনিক যৌগ
(৪) অজৈব পঞ্চযোজী আর্সেনিক যৌগ
(৫) জৈব পঞ্চযোজী আর্সেনিক যৌগ
(৬) এলিমেন্টাল আর্সেনিক (elemental arsenic.)

ত্রিযোজী আর্সেনিক যৌগগুলো (Arsenite) এবং পঞ্চযোজীগুলো আর্সেনেট (Arsenate) নামে পরিচিত। পানিতে সাধারণত আর্সেনাইট, আর্সেনেট, মনোমিথাইল আর্সেনিক এসিড, ডাই মিথাইল আর্সেনিক এসিড- এই চারটি যৌগ থাকে। তবে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকে আর্সেনাইট ও আর্সেনেট। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ভূ-গর্ভস্থ পানিতে এই দুটি যৌগেরই উপস্থিতি সনাক্ত করা হয়েছে।

১.৪ পরিবেশে আর্সেনিকের উপস্থিতি

আর্সেনিক সর্বব্যাপ্ত একটি উপাদান। প্রকৃতিতে এর রয়েছে অফুরন্ত উৎস। পৃথিবীতে বিরাজমান অসংখ্য আর্সেনিক যৌগের কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে পর্যাপ্ততার বিচারে আর্সেনিকের অবস্থান হচ্ছে বিশতম।

বাতাস, মাটি, পানিসহ প্রকৃতির প্রতিটি মাধ্যমেই কম বেশি আর্সেনিক আছে। মাটিতে সব সময়ই কিছু না কিছু আর্সেনিক থাকে। ভূ-গর্ভস্থ শিলাস্তরের সঙ্গে মিশে আছে আর্সেনিকের বিভিন্ন খনিজ। পৃথিবীর মাটি, খনিজ শিলায় সাধারণত প্রতি কেজিতে দেড় থেকে ২ মিলিগ্রাম হিসেবে আর্সেনিক থাকে। তবে দূষণযুক্ত মাটিতে আর্সেনিকের পরিমাণ কেজি প্রতি ৫৫০মিলিগ্রাম পর্যন্ত থাকতে পারে। শিল্প ও কলকারখানার বর্জ্য থেকে আর্সেনিক বিষ বায়ুমণ্ডলে ছড়াতে পারে। বায়ুতে সাধারণত ০.০৪ থেকে ৩০ ন্যানোগ্রাম/ ঘনমিটার আর্সেনিক থাকে। নির্দিষ্ট কিছু শিল্প কারখানার আশেপাশের বায়ুতে আর্সেনিকের পরিমাণ অবশ্য আরো বেশি পাওয়া যায়। সাধারণ অবস্থায় পানিতেও সামান্য পরিমাণ আর্সেনিক থাকে। প্রাকৃতিক জলাধারে প্রতি লিটার পানিতে ১-২ মাইক্রোগ্রাম আর্সেনিক থাকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে, এছাড়াও আগ্নেয়গিরির লাভাতে, জিওথার্মাল সিস্টেম, ইউরোনিয়াম ও স্বর্ণখনি ও কয়লার খনিতে আর্সেনিক থাকে।

বেশির ভাগ ফলমূল, শাকসবজি, মাছ-মাংসে সামান্য পরিমান আর্সেনিক থাকে। তবে সমুদ্রের পানি ও সামুদ্রিক মাছে বেশ উচ্চমাত্রায় আর্সেনিক থাকে। সামুদ্রিক কিছু প্রজাতির মাছের প্রতি কেজিতে ৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত আর্সেনিক থাকতে পারে। অর্থাৎ প্রতিদিনই বাতাস, খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে মানুষ কিছু না কিছু আর্সেনিক গ্রহণ করছে। তবে পরিমাণ কম থাকায় স্বাভাবিক অবস্থায় এভাবে গৃহীত আর্সেনিক শরীরের জন্য তেমন ক্ষতিকারক নয়। খাদ্যের মাধ্যমে মানুষ যে আর্সেনিক গ্রহণ করে প্রকৃতির দিক থেকে তা জৈব, যার বিষাক্ততা অজৈব আর্সেনিক থেকে অনেক কম। আপাতদৃষ্টিতে কোন অসুবিধা ছাড়াই মানুষ প্রতিদিন তার শরীরের প্রতি কেজি ওজনের বিপরীতে ১৫০ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত আর্সেনিক সহ্য করতে সক্ষম। তবে স্পর্শকাতর মানুষ কেজি প্রতি দিনে ২০ মাইক্রোগ্রামেই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

১.৫ আর্সেনিকের ব্যবহার

কৃষি ও শিল্পখাতের বহু পণ্যে আর্সেনিকের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। আর্সেনিক একটি মারাত্মক বিষ হলেও এমনকি ওষুধ তৈরিতেও তা ব্যবহৃত হয়।

কীটনাশক. গ্লাস, গ্লাসওয়্যার, বিভিন্ন শিল্প, কেমিক্যাল, তামা ও সীসার সংকর ধাতু এবং ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত আর্সেনিক যৌগটির নাম আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড। কৃষিতে লেড আর্সেনেট, কপার এসিটোআর্সেনাইট, সোডিয়াম আর্সেনাইট, ক্যালসিয়াম আর্সেনাইট এবং আর্সেনিকের বিভিন্ন জৈব যৌগ কীটনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয় মনোমিথাইল আর্সোনিক এসিড এবং ডাইমিথাইল আর্সোনিক এসিড ব্যবহৃত হয় হার্বিসাইড হিসেবে।

ক্রোম্যাটেড কপার আর্সেনাইট, সোডিয়াম আর্সেনাইট এবং জিঙ্ক আর্সেনাইট কাঠের সুরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়। আর্সানিলিক এসিডের মত আর্সেনিকের কিছু ফিনাইল যৌগ পোল্ট্রি খামারে হাঁস-মুরগীর খাবারে দ্রুত শরীর বৃদ্ধিকারক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিছু কিছু দেশে সামান্য পরিমাণ আর্সেনিক ওষুধ তৈরিতে এখনো ব্যবহৃত হয়। চর্মরোগ, যক্ষ্মা, লিউকেমিয়া, হাঁপানী, কুষ্ঠ, সিফিলিস, অ্যামিবীয় আমাশয় ইত্যাদি রোগের ওষুধে আর্সেনিকের ব্যবহার রয়েছে। হোমিওপ্যাথিক ওষুধেও আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। আর্সেনিকযুক্ত ওষুধ ব্যবহারে রোগীদের শরীরে ত্বকের ক্যান্সার হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রং, অস্বচ্ছ এনামেল, বিষাক্ত গ্যাস, ট্রানজিস্টার, সেমিকন্ডাকটর তৈরি, পশু চামড়া সংরক্ষণ, টেক্সটাইল, কাগজ এবং অস্ত্র শিল্পে আর্সেনিকের ব্যবহার রয়েছে।

বিষয়বস্তু-২ ঃ ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক সংমিশ্রণ, মানবদেহে আর্সেনিক এর লক্ষণ সমূহ, প্রতিক্রিয়া ও আর্সেনিক দূষণ রোধে করণীয়

উদ্দেশ্য	ঃ	এই বিষয়বস্তু আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বর্ণনা করতে/বলতে সক্ষম হবেন ঃ- ● ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক সংমিশ্রণ ও আর্সেনিক দূষণ ● শরীরে আর্সেনিক গ্রহণের মাত্রা বা পরিমাণ থেকে এর বিষক্রিয়া ● শরীরে আর্সেনিকের প্রবেশ ও নিঃসরণ ● মানবদেহে আর্সেনিকজনিত রোগের উপসর্গ ● আর্সেনিক দূষণের ফলে মানবদেহে প্রতিক্রিয়া ● আর্সেনিকজনিত রোগের চিকিৎসা ও রোগ ব্যবস্থাপনা ● আর্সেনিক মুক্ত পানি পানে করণীয় ● আর্সেনিক দূষণমুক্ত পানির উৎস
সময়কাল	ঃ	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
উপকরণ	ঃ	হোয়াইটবোর্ড, হোয়াইটবোর্ড মার্কার, ফ্লিপ চার্ট বোর্ড, ফ্লিপ চার্ট পেপার, ফ্লিপ চার্ট মার্কার, ভিপ (VIPP) কার্ড, সাদা কাগজ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, OHP, ট্রান্সপারেন্সি, ডাষ্টার, ম্যানুয়াল।

পরিচালন প্রক্রিয়া ঃ

বিষয়		কার্যক্রম
বিষয়বস্তুর নাম ও উদ্দেশ্য	ঃ	বিষয়বস্তুর নাম লিখিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এই বিষয়বস্তু থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা কি শিখতে চায় তা প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিতে হবে। পূর্বে লিখিত নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ উপস্থাপন করতে হবে।
আলোচনা	ঃ	প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে। প্রশ্ন অংশগ্রহণকারীকে আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে । খেয়াল রাখতে হবে পদ্ধতিগতভাবে প্রশ্ন উপস্থাপন করা হচ্ছে কি না? অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু ফ্লিপ চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে।
বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ	ঃ	আলোচনা শেষে পুরো অধ্যায় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হবে।
মূল্যায়ন	ঃ	প্রশ্ন উপস্থাপন এবং উত্তর প্রদানের মধ্য দিয়ে অধ্যায়টি অংশগ্রহণকারীরা কতটুকু জেনেছে তা মূল্যায়ন করতে হবে।

২.১ আর্সেনিক ঃ ভূ-গর্ভস্থ পানিতে দূষণ

পানির প্রধান ৩টি উৎস অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি এবং বৃষ্টির পানির মধ্যে শেষোক্ত দু'টিকে প্রাকৃতিক অবস্থায় কোনরূপ পরিশোধন ছাড়াই পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বৃষ্টির পানির তুলনায় ভূ-গর্ভস্থ পানি সহজলভ্য ও নিরাপদ। অপরদিকে ভূ-পৃষ্ঠের পানি বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও শুষ্ক মৌসুমে পাওয়া যায় না এবং এই পানি জীবাণু দ্বারা দূষিত। এই পানি পরিশোধন ছাড়া পান করা যায় না এবং পরিশোধন প্রক্রিয়া বেশ ব্যয়বহুল ও জটিল।

যেহেতু ভূ-গর্ভস্থ পানি নিরাপদ, সহজে উত্তোলন যোগ্য এবং সবসময় পাওয়া যায় তাই জনগণ এই পানির উপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল। যখন দেশের ৯৭% জনগণ সবকাজে নলকূপের (ভূ-গর্ভস্থ) পানি ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তুলেছে তখনই নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণ ধরা পড়ে। জরীপে দেখা গেছে বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৪৪টি জেলার অধিকাংশ নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণ হয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানিতে অত্যধিক মাত্রায় আর্সেনিক উপস্থিতির প্রকৃত কারণ এবং এর উৎস এখনো একটি বিতর্কিত বিষয়। চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ মোটামোটি একমত যে, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মাটির সঙ্গে মিশে আছে আর্সেনিকের বিভিন্ন যৌগ। বাংলাদেশের ভূ-ত্বকের গঠন এবং তাতে আর্সেনিক যৌগের উপস্থিতির কারণ খুবই জটিল একটি বিষয়। সংক্ষেপে এখানে সে সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া যেতে পারে।

যেসব এলাকাতে আর্সেনিক দেখা দিয়েছে সেখানে পলি অবক্ষেপণ ঘটেছিল কোয়াটার্নারি যুগে, ২৫ থেকে ৮০ হাজার বছর আগে (সাধারণভাবে তা Younger Deltaic Deposition বা YDD নামে পরিচিত)। এই পলি অবক্ষেপণ এখনও চলছে এবং তা সমগ্র পলিভূমি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। অতীতে আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকাগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে বেশি বেশি জরিপের মাধ্যমে এলাকাগুলো পরস্পর জুড়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং বর্তমানে এলাকাগুলোর মধ্যে কোন ফাঁক নেই। এই নিরবিচ্ছিন্ন এলাকার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের ৪৪টি জেলা, যেগুলোর বেশির ভাগেই শেষাবধি আর্সেনিক দূষণের প্রমাণ পাওয় গেছে।

অনেকেরই ধারণা, হিমালয় পর্বতমালায় অবস্থিত আর্সেনিকযুক্ত খনিজ পদার্থ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বড় বড় নদী বিশেষত গঙ্গা (পদ্মা) নদী দিয়ে পলির সাথে বাহিত হয়ে এসে আমাদের এই পাললিক ভূমি গঠন করেছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার ভূগর্ভের পলল স্তরের মধ্যে বিভিন্ন গভীরতায় আর্সেনিক খনিজের কিছু পকেট অছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রাজমহল গিরিশ্রেণীর ব্যাসল্ট লাভার (কোটি কোটি বছর আগে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু আর্সেনিক খনিজ শিলার ক্ষয়প্রাপ্তির সঙ্গে নির্গত হয়েছে এবং নদীবাহিত পললের সঙ্গে এসে বাংলাদেশের বদ্বীপ এলাকা গঠিত হওয়ার সময় এখানকার ভূগর্ভের পলল স্তরে সঞ্চিত হয়ে বিভিন্ন পকেটের সৃষ্টি করেছে।

ভূ-তত্ত্ববিদদের মতে দীর্ঘস্থায়ী ভূ-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ভূ-গভীরে গঠিত হচ্ছে আর্সেনিক খনিজ। ভূপৃষ্ঠের প্রতিনিয়ত ভাঙ্গন ও ক্ষয়ের কারণে এক এলাকার পলিমাটি নদীবাহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্র। এই পরিবাহিত পলিমাটি দিয়ে বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হয় নতুন ভূ-পৃষ্ঠ। এই প্রক্রিয়ায় ভূ-গর্ভে সঞ্চিত আর্সেনিকেরও স্থানবদল ঘটে। বাংলাদেশের অবস্থান গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিনটি বৃহৎ নদীপথের নিম্নপ্রান্তে। এই তিনটি নদীপথের উৎসমুখ জুড়ে আছে বিশাল এক এলাকা হিমালয় পর্বতমালা, ইন্ডিয়ান শিল্ড, শিলং মালভূমি ও গাঙ্গেও সমভূমি। ফলে উক্ত তিনটি নদীপথের মাধ্যমে প্রতিবছর কোটি কোটি টন পলিমাটি পরিবাহিত হয়ে বাংলাদেশের নদ-নদীর মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ধারণা করা হচ্ছে, এই পলিমাটির সঙ্গে আর্সেনিকও আসে এবং তা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ভূ-গর্ভে এসে জমা হচ্ছে।

২.২ পানিতে আর্সেনিকের সংমিশ্রণ

ভূ-গর্ভস্থ আর্সেনিকের খনিজ বিশ্লিষ্ট হয়ে পানিতে দ্রবীভূত হয়ে কিভাবে দূষণ ছড়াচ্ছে সে সম্পর্কে এখনো চুড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তবে সম্ভাব্য অভিমত বা তত্ত্বের মধ্যে একটি হচ্ছে জারন তত্ত্ব (অক্সিডেশন থিওরি)। টিউবওয়েলের মাধ্যমে ভূগর্ভের পানিবাহী স্তরে বাতাসের সংস্পর্শ ঘটছে। এই বাতাসের সংস্পর্শে এসে আর্সেনিক জারিত হয় এবং এর ফলে আর্সেনিক বেরিয়ে এসে পানিতে দ্রবীভূত হচ্ছে। ফলে বর্তমানের ভয়াবহ আর্সেনিক দূষণকে পুরোপুরিই মানব সৃষ্ট বলে অভিহিত করা যায়। ভূগর্ভের পানির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে এ সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা [১]।

ভূগর্ভের পলল স্তরে আর্সেনিকের যে যৌগটি সঞ্চিত আছে বলে অনেকেই ধারণা করেছেন, তার নাম আর্সেনোপাইরাইট। আর্সেনিকের যৌগগুলোর মধ্যে এটিই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মজুদ আছে। আর্সেনোপাইরাইটের রাসায়নিক সংযুক্ত-লৌহযুক্ত আর্সেনিক সালফাইড, যার ফর্মুলা $FeAsS$। শত শত বছর ধরে ভূ-গর্ভে সঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও আর্সেনোপাইরাইট পানিকে দূষিত না করার কারণ তা স্বাভাবিকভাবে পানিতে দ্রবীভূত হয় না।

ভূ-গর্ভের যে স্তরে পানি থাকে ভূ-তত্ত্বের পরিভাষায় সেই স্তরকে বলা হয় পানিবাহী স্তর বা এ্যাকুইফার। এ্যাকুইফারসমূহ মাটি, বালি ও বিভিন্ন ধরণের শিলা দিয়ে গঠিত এ্যাকুইফারের উপাদানের দানাগুলোর মধ্যে বিরাজমান অসংখ্য ফাঁক এবং এ্যাকুইফারের মধ্যে যেসব ফাটল থাকে সেগুলো সবসময় পানিতে পূর্ণ থাকে। এই পানি সহজেই নির্গত হতে পারে এবং তাই নলকূপের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়।

পানিবাহী স্তরের পানির উপরিতলকে ধরা হয় ওয়াটার টেবিল। ভূ-গর্ভ থেকে পানি পেতে হলে এই ওয়াটার টেবিল পর্যন্ত নলকূপের পানিকে পৌঁছতে হয়। মধ্যবর্তী অংশ অর্থাৎ ওয়াটার টেবিল থেকে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত যে স্থান তাকে বলা হয় বায়ুসক্রিয় অঞ্চল বা অ্যারেটেড জোন বা ভ্যাডোজ জোন (Vadose Zone)। এই অঞ্চলের শিলা বা মাটির দানাগুলোর পরস্পরের মধ্যকার ফাঁক ও ফাটলগুলো প্রধানত বায়ুতে পূর্ণ থাকে। বায়ুসক্রিয় অঞ্চলে বাতাসের অক্সিজেন অত্যন্ত সক্রিয় থাকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ পানি এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে ক্রমশ ওয়াটার টেবিলে পৌঁছে ভূগর্ভের পানির সাথে মিশে যায়। এই পানি ও বাতাসের সঙ্গে বিষক্রিয়ার ফলে এতদঞ্চলের পদার্থগুলো ধীরে ধীরে জারিত হয়। অনুকূল পরিস্থিতিতে পদার্থগুলো জলাশ্লিষ্ট হয়েও দ্রবীভূত হতে পারে।এই মতবাদটাকে জারন তত্ত্ব (অক্সিডেশন থিওরি) বলা হয়।

নলকূপ দিয়ে পানি উত্তোলনের ফলে ওয়াটার টেবিলে সৃষ্ট ড্র-ডাউনের কারণে বায়ুসক্রিয় অঞ্চলের বিস্তার বাড়ে এবং কাছাকাছি থাকা আর্সেনোপাইরাইটের পকেটগুলো বায়ুসক্রিয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বায়ুসক্রিয় অঞ্চলের বায়ুর মাধ্যমে আর্সেনোপাইরাইট জারিত হয় এবং পানিকে দূষিত করে [১]।

পানিতে আর্সেনিক মিশ্রণের দ্বিতীয় অভিমত বা তত্ত্ব হচ্ছে বিজারণ (রিডাকশন) তত্ত্ব। আয়রন অক্সিহাইড্রোক্সাইডের বিজারণ এবং অধিশোষিত আর্সেনিক মুক্ত হয়ে পানিতে মিশ্রণের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানিকে দূষিত করে। এ পদ্ধতিতে সারা বিশ্বে ভূ-গর্ভস্থ পানি আর্সেনিকে আক্রান্ত হচ্ছে। পরীক্ষালব্ধ ফলাফল দেখা যায় যে, আর্সেনিক আক্রান্ত স্তরের পানিতে জারন-বিজারন ঘটার সম্ভাবনা সূচক বিভব (অক্সিডেশন রিডাকশন পটেনশিয়াল বা ও.আর.পি) ঋণাত্মক মানের, যা বিজারন ঘটার সম্ভাবনা নির্দেশ করে। বেঙ্গল বেসিনে অবস্থিত পলিমাটিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি অপ্রত্যাশিত নয়। মাটির নিচে চাপা পড়া আকরিকের জৈবিক ক্ষয় প্রক্রিয়া আয়রন অক্সিহাইড্রোক্সাইডের বিজারন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং এর ফলে উচ্চ হারে আর্সেনিক ভূ-গর্ভস্থ পানির সাথে দ্রবীভূত হয়। তবে এককভাবে "বিজারন প্রক্রিয়া" অত্যাধিক মাত্রায় আর্সেনিক দূষণ সংঘটনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয় [১০]।

২.৩ আর্সেনিক ঃ মানবদেহে এর প্রতিক্রিয়া

আর্সেনিক একটি মারাত্মক বিষ। এই বিষের মারণ মাত্রা (fatal dose) ১২৫ মিলিগ্রাম। পারদের তুলনায় এই বিষ চারগুণ শক্তিশালী। আর্সেনিকের বিষক্রিয়াগুলো হল বমি, রক্তবমি, পেটের যন্ত্রণা, জণ্ডিস, কিডনির কার্যক্ষমতা লোপ পাওয়া, মাথার যন্ত্রণা, হাতে পায়ে কালো কালো দাগ, কুষ্ঠের মতো ঘা এবং দীর্ঘকাল ভোগার পর ক্যান্সার। আর্সেনিক দূষণ প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত রোগীর নখ এবং চুল পরীক্ষা করলেই এই বিষের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, কারণ শরীরস্থ আর্সেনিকের একটা বড় অংশ চুলে ও নখে এসে জমা হয় [১]।

নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বায়ু থেকে ও মুখগহ্বরের মাধ্যমে খাদ্য ও পানীয় থেকে মানুষের শরীরে আর্সেনিক প্রবেশ করে। নিঃশ্বাস বা খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে আর্সেনিক শরীরে প্রবেশের পর তা কি ধরনের বিষক্রিয়া ঘটাবে সেটা নির্ভর করে গৃহীত আর্সেনিকের পরিমাণ এবং এর ভৌত-রাসায়নিক অবস্থার উপর। আন্তর্জাতিক ক্যান্সার গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইএআরসি) ক্যান্সার সৃষ্টির ঝুঁকি বিবেচনা করে বিভিন্ন রাসায়নিককে যেসব ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করেছে তার মধ্যে অজৈব আর্সেনিককে রাখা হয়েছে ১ নম্বর গ্রুপে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আর্সেনিক দূষণে ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর বহু ঘটনা রয়েছে। চিলি ও তাইওয়ানে আর্সেনিকজনিত ক্যান্সারে বহু লোক মৃত্যুবরণ করেছে। দেখা গেছে, তামার ধাতু গলানো প্ল্যান্টে ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন এমন শ্রমিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে ক্যান্সারে মৃত্যুও ঘটনা ঘটেছে। কারণ এই শ্রমিকরা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে অতিরিক্ত আর্সেনিক গ্রহণ করেছিল।

শরীরে আর্সেনিক গ্রহণের মাত্রা বা পরিমাণ থেকে এর বিষক্রিয়াকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

১। তীব্র বা একিউট বিষক্রিয়া (Acute Toxicity)

২। মাঝারি বা সাব-একিউট বিষক্রিয়া (Sub-acute Toxicity)

৩। দীর্ঘ বা ধীর বিষক্রিয়া (Chronic Toxicity)। বাংলাদেশের আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকাগুলোতে ধীর বিষক্রিয়ার ঘটনা ঘটেছে।

তীব্র বিষক্রিয়া ঃ তীব্র আর্সেনিক বিষক্রিয়া সাধারণত হত্যা, আত্মহত্যাজনিত কারণে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মারণমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৩০ মিলিগ্রাম এবং এই পরিমাণ আর্সেনিক গ্রহণের ১২ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। আর্সেনিক গ্রহণের আধাঘন্টার মধ্যেই আর্সেনিকের লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করে। তীব্র বিষক্রিয়া প্রথমে বমি বমি ভাব হতে পারে, গলায়, পাকস্থলীতে অসম্ভব জ্বালাপোড়া শুরু হয়। হাত-পায়ের মাংসপেশীতে খিঁচুনি ধরে এবং রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে এরপর তীব্র পানির পিপাসা হয় এবং রোগী বমি করতে থাকে, এরপর ঘন ঘন পায়খানা শুরু হয়। প্রথমে পায়খানার বর্ণ থাকে কালো ও রক্তমিশ্রিত। পরে তা বর্ণহীন, গন্ধহীন হয়ে পড়ে এবং পানির আকারে বের হতে থাকে। এরপর আস্তে আস্তে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

মাঝারি বিষক্রিয়া ঃ অল্প অল্প আর্সেনিক নির্দিষ্ট বিরতিতে গ্রহণ করলে মাঝারি ধরনের বিষক্রিয়া ঘটে থাকে। এ ধরনের বিষক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে যেসব উপসর্গ লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে রয়েছে: বদহজম, কফ, গলায় শিরশির ভাব, বমি, তলপেটে ব্যাথাসহ পায়খানার বেগ ইত্যাদি। রোগীরা বিষন্নতায় ভোগে এবং ক্রমান্বয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে। পায়খানায় রক্ত যেতে থাকে, স্নায়ুপ্রদাহ শুরু হয়। মাংসপেশীতে খিঁচুনী তৈরি হয়। রোগীরা অস্থির হয়ে পড়ে, ঘুমাতে পারে না এবং শেষাবধি মৃত্যুবরণ করে।

ধীর বা ক্রনিক বিষক্রিয়া ঃ সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক দীর্ঘদিন ধরে শরীরে গ্রহণ করলে ক্রনিক বিষক্রিয়া ঘটে। আর্সেনিক গ্রহণের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ক্রনিক বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেতে ৬ মাস থেকে ২ বছর বা তারও অধিক সময় লাগে। ত্বক স্নায়ুতন্ত্র, যকৃৎ, হৃদপিন্ড, শ্বাসতন্ত্রসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ এই বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

২.৪ শরীরে আর্সেনিকের প্রবেশ ও নিঃসরণ

আর্সেনিক শরীরের নিজস্ব কোন উপাদান না। মানব শরীরে আর্সেনিক গ্রহণের পর তার সিংহভাগই বের হয়ে যায়। কিছু অংশ আবার বিভিন্ন কোষকলায় জমা হয়। তবে শরীরে প্রবেশ ও নিঃসরণ বিষয়টি নির্ভর করে গৃহীত আর্সেনিকের পরিমাণ এবং এর ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর। খাদ্যদ্রব্যে থাকা আর্সেনিক এবং আর্সেনিক এসিডের জৈব যৌগগুলো শরীর সহজেই শুষে নেয়। শুষে নেওয়ার পর পরই আর্সেনিক যকৃৎ, কিডনী, প্লীহা, হৃদপিণ্ড, মজ্জা, ফুসফুস, অগ্নাশয়, মাংসপেশী, পাকস্থলী, থাইরয়েড গ্রন্থি, ত্বক, মস্তিষ্ক, স্পাইনাল কর্ডসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। অজৈব আর্সেনিক জৈব আর্সেনিকের চেয়ে অনেক বেশি বিষাক্ত। ত্রিযোজী অজৈব আর্সেনিক বহু এনজাইমের স্বাভাবিক কাজে বাধার সৃষ্টি করে থাকে।

বিষাক্ততার মাত্রা কম-বেশি থাকলেও আর্সেনিক শরীরের সবগুলো অঙ্গ ও তন্ত্রেরই ক্ষতি করে। দ্রবীভূত আর্সেনিক অদ্রবীভূত আর্সেনিকের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর। সামগ্রিকভাবে শরীরে আর্সেনিকের বিষাক্ততা বা ক্ষতির বিষয়টি নির্ভর করে আর্সেনিক যৌগের রাসায়নিক ভৌত অবস্থা, শরীরে প্রবেশের পথ ও মাধ্যম, ডোজ, গ্রহণের সময়কাল, ব্যক্তি বিশেষের খাদ্যের পুষ্টিমান, বয়স ইত্যাদির উপর।

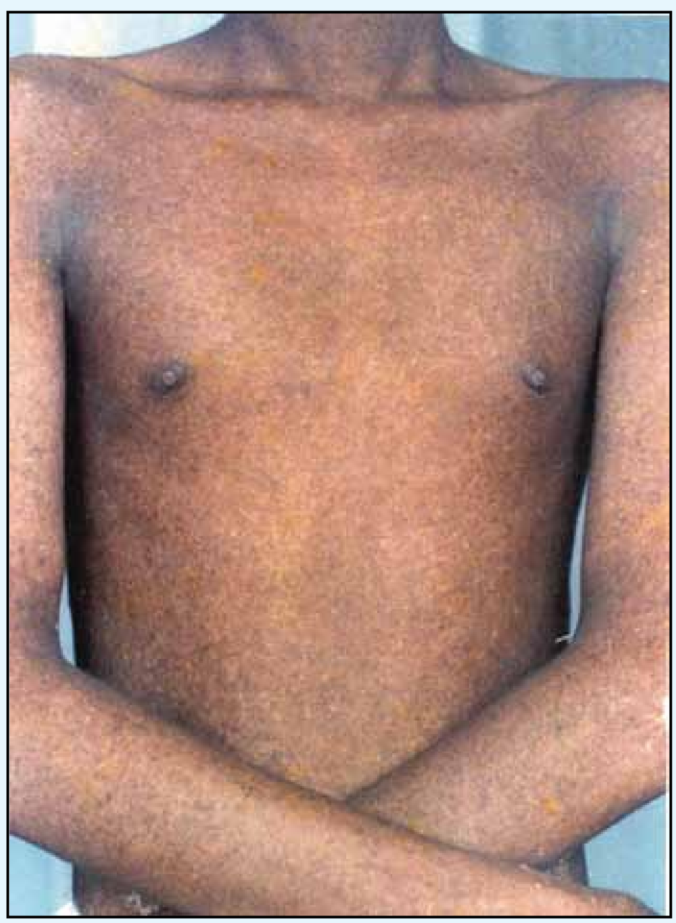

ছবি - ১ : আর্সেনিক দূষণ যুক্ত পানি গ্রহণে মানব দেহের প্রতিক্রিয়া

(সমস্ত দেহের ত্বকে মেলানোসিসের চিহ্ন বিদ্যমান)

নিঃসরণ ঃ দ্রবীভূত ত্রিযোজী এবং পঞ্চযোজী- উভয় ধরনের আর্সেনিক যৌগ গ্রহণের পর দ্রুত তা শরীরে শোষিত হয়। শোষিত হওয়ার পর সিংহভাগই প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয়ে যায়। অবশ্য ক্ষুদ্র একটা অংশের নিঃসরণ ঘটে মলের মাধ্যমে। ত্বক, চুল ও নখ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শ্বাসনালীর নিঃসরণের মাধ্যমেও শরীর থেকে আর্সেনিক দূরীভূত হয়। শরীরে আর্সেনিক প্রবেশের ২-৮ ঘন্টার মধ্যে প্রস্রাবে তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আর্সেনিক গ্রহণের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গৃহীত আর্সেনিকের ২৫ শতাংশ প্রস্রাবের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। আর প্রায় ৭৫ শতাংশ বের হয় এক সপ্তাহের মধ্যে। প্রস্রাবে যে আর্সেনিক পাওয়া যায় তা হচ্ছে মিথাইল আরসোনিক এসিড এবং ডাইমিথাইল আর্সিনিক এসিড। কেরাটিনের সঙ্গে যুক্ত হয় বলেই শরীরে গৃহীত আর্সেনিকের একটা অংশ ত্বক, চুল, ও নখে এসে জমা হয়। এসব কারণেই আর্সেনিক আক্রান্তদের সনাক্ত করতে প্রস্রাব, ত্বক, চুল ও নখ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। অল্পদিনের আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের সনাক্ত করতে প্রস্রাবের পরীক্ষায় সবচেয়ে কার্যকর। রক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি সনাক্তকরণের কাজে খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ রক্তে আর্সেনিকের উপস্থিতির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা আবার শরীর থেকে প্রস্রাবের মাধ্যমে বের হয়ে যায়।

শরীরে আর্সেনিক প্রতিক্রিয়া ঘটেনি এমন ব্যক্তিদের প্রস্রাবে আর্সেনিকের মাত্রা থাকে ০.০১-০.০১৫ মিগ্রা/লিটার। চুলের ক্ষেত্রে এ মাত্রা প্রতি কেজিতে ১ মিলিগ্রামের চেয়ে কম, নখে ০.৪৩-১.০৮ মিগ্রা/কেজি, রক্তে ০.০০১৫-০.০০২৫ মিগ্রা/লিটার। অর্থাৎ এগুলো স্বাভবাবিক মাত্রা। ত্বকে কি পরিমাণ আর্সেনিকের উপস্থিতিকে স্বাভাবিক বলা যাবে, সে সম্পর্কে অবশ্য কোন গাইডলাইন নেই।

২.৫ আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা

যে কোন পানিতে কিছু না কিছু আর্সেনিক আছে। পানিতে যদি প্রতি লিটারে ০.০১ মিলিগ্রাম অর্থাৎ দশ কোটি ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত আর্সেনিক থাকে, তবে তার দ্বারা স্বাস্থ্য ঝুঁকি অত্যন্ত কম থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এই মাত্রাকেই স্বাভাবিক মাত্রারূপে ঘোষণা করেছে। উন্নত দেশগুলোতে এই মাত্রার অধিক মাত্রার আর্সেনিক পানিতে থাকলে তাকে পানের অযোগ্য বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একথাও বলেছে যে প্রতি লিটারে ০.০৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত আর্সেনিক মানুষের পক্ষে সহনীয় (Tolerance) [১]।

ছবি ২ : হাতের তালু কেরাটোসিসে আক্রান্ত

ছবি ৩ : পায়ের তালু কেরাটোসিসে আক্রান্ত

ছবি ৪ : পায়ের তালু ডরসাল কেরাটোসিসে আক্রান্ত

ছবি ৫ : আর্সেনিক মেলানোসিসে আক্রান্ত শিশু

২.৬ আর্সেনিকোসিসের উপসর্গ

আর্সেনিক দূষিত পানি পান করার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। উপসর্গগুলো শরীরে দৃশ্যমান হতে ৮-১০ বছর সময় লেগে যায়। তবে এরও ব্যতিক্রম আছে। ব্যক্তিভেদে বিষক্রিয়ার বাহ্যিক প্রকাশে হেরফের ঘটে থাকে। কত দ্রুত বা কত ধীরে উপসর্গগুলো দৃশ্যমান হবে তা নির্ভর করে পানির মাধ্যমে গৃহীত আর্সেনিকের পরিমাণ, ব্যক্তিবিশেষের খাদ্যের পুষ্টিমাণ, তার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, দূষিত পানি পানের সময়কাল ইত্যাদির উপর। সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রার (০.০৫ মিগ্রা/লিটার) চেয়ে বেশি আর্সেনিক যদি পানির মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় এবং দৈনিক দূষিত পানি পানের পরিমাণ যদি বেশি হয়, তাহলে আর্সেনিকোসিসের লক্ষণগুলো তুলনামূলকভাবে দ্রুত প্রকাশ পায় [১]।

উপসর্গগুলোর মধ্যে যে দুটি সবচেয়ে বেশি শরীরে প্রকাশ পায় সেগুলো হচ্ছে ঃ মেলানোসিস ও কেরাটোসিস। মেলানোসিস মানে ত্বকের স্বাভাবিকতা বিনষ্ট হওয়া। এতে আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বকের স্বাভাবিক রং বদলে ক্রমশ কালচে হয়ে যায়। প্রথমে হাত ও পায়ে এ পরিবর্তন দেখা দেয়, পরে সমগ্র শরীরে দৃশ্যমান হয়। গোটা শরীর জুড়ে ত্বকের রং পরিবর্তনকে বলা হয় ডিফিউজ মেলানোসিস। আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হলেই যে ডিফিউজ মেলানোসিস হবে

এমন কোন ধরা-বাধা নিয়ম নেই। স্পটেড মেলানোসিস হয় শরীরের বিভিন্ন স্থানে আলাদাভাবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা দেখা যায় বুকে ও পিঠে। এছাড়াও আছে লিউকোমেলানোসিস বা রেইনড্রপ পিগমেন্টেশন। এতে শরীরে সাদা-কালো দাগের একটা সংমিশ্রণ তৈরি হয়। শরীরে মেলানোসিসের লক্ষণ প্রকাশের পর যারা দূষিত পানি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন, সাধারণত তাদের শরীরেই লিউকোমেলানোসিসের প্রকাশ বেশি ঘটতে দেখা গেছে। এছাড়াও আক্রান্ত ব্যক্তির জিহ্বা, ঠোঁট ইত্যাদিতে মেলানোসিসের উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়।

কেরাটোসিসে হাত ও পায়ের তালু আস্তে আস্তে পুরু ও শক্ত হয়ে যায়। হাত ও পায়ের তালু পুরোটা শক্ত হয়ে গেলে তাকে বলা হয় ডিফিউজ কেরাটোসিস। এই কেরাটোসিসের ওপর আঁচিলের মতো শক্ত গোটা পরিলক্ষিত হলে তাকে বলা হয় স্পটেড বা নডিউলার কেরাটোসিস। এ ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পেলে রোগী আর্সেনিকের মাঝারি মানের বিষক্রিয়ার আক্রান্ত হয়েছে বলে ধরতে হবে। শরীরের ত্বক রুক্ষ, শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি হাত ও পায়ের তালুতে স্পটেড কেরাটোসিসের লক্ষণ প্রকাশ পেলে বুঝতে হবে রোগীর অবস্থা জটিল আকার ধারণ করেছে।

হাত, পায়ের তালু কেরাটোসিস, আঁচিলের মতো গোটা উঠলেও এগুলোতে ব্যথা বা চুলকানি অনুভূত হয় না। আস্তে আস্তে তালুতে ঘা হয়। এই অবস্থাকে বলা যেতে পারে ক্যান্সার পূর্ব পর্যায়। আর্সেনিক বিষক্রিয়ার ফলে মানব শরীরের ক্ষুদ্র রক্তনালীতে ক্ষত সৃষ্টি হয়। এই ক্ষতের কারণে হাত, পায়ে ঘা বা পচন দেখা দিতে পারে (গ্যাংগ্রিন), যা ক্ষেত্রবিশেষে কেটে বাদ দিতে হয়।

এছাড়াও শারীরিক দুর্বলতা, অরুচি, চোখের প্রদাহ, ব্রংকাইটিস, বেশি গরম অনুভূত হওয়া, কাশি ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। পরিপাকতন্ত্রের প্রদাহ থেকে শুরু করে ব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি হওয়া, পেটের অসুখ ইত্যাদি প্রকাশ পেতে পারে। সর্বোপরি রয়েছে ত্বকের ক্যান্সার। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ক্রনিক আর্সেনিকোসিসের ক্ষেত্রে সবার শরীরেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। ব্যক্তি বিশেষের দেহের জীনগত বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের কারণেই হয়তো এমনটা ঘটে থাকতে পারে। এই কারণে উপসর্গ দেখা না গেলেও দৃশ্যত আক্রান্ত হয়নি এমন ব্যক্তি বিশেষের কোষকলা পরীক্ষা করে উচ্চমাত্রার আর্সেনিক পাওয়া গেছে।

২.৭ আর্সেনিক দূষণ ঃ মানবদেহে প্রতিক্রিয়া

আর্সেনিক দূষনের প্রতিক্রিয়ার ফলে মানবদেহের উপসর্গগুলো সকল দেশে একই রূপ হলেও স্থান ও মানবগোষ্ঠী অনুযায়ী তার কিছুটা তারতম্য কিছুটা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে মানুষের দেহে ত্বক বা চামড়ার উপসর্গগুলোই প্রধানত দেখা যাচ্ছে। তবে তা থেকে দেহের যে কোন অঙ্গ জটিলতায় আক্রান্ত হতে পারে।

আর্সেনিক দূষণের ফলে মানবদেহে প্রতিক্রিয়ার লক্ষণসমূহ

১। প্রাথমিক পর্যায়

- ক) চামড়ার রং কালো হয়ে যাওয়া (ছোট ছোট কালো দাগ অথবা সম্পূর্ণ কালো হয়ে যাওয়া - মেলানোসিস)
- খ) চামড়া শক্ত ও খসখসে হয়ে যাওয়া (বিশেষ করে হাত ও পায়ের তালু - কেরাটোসিস)
- গ) চোখ লাল হয়ে যাওয়া (কনজাংটিভাইটিস)
- ঘ) শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটিস)
- ঙ) বমিবমি ভাব, বমি, পাতলা পায়খানা (গ্যাস্ট্রোএনটেরাইটিস)

২। দ্বিতীয় পর্যায়

- ক) ত্বকের বিভিন্ন স্থানে সাদা-কালো দাগ (লিউকো-মেলানোসিস)
- খ) হাতে ও পায়ের তালুতে শক্তগুটি ওঠা (হাইপার কেরাটোসিস)
- গ) পা ফুলে যাওয়া (নন্‌ পিটিং ইডেমা)
- ঘ) প্রান্তীয় স্নায়ুরোগ (পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি)
- ঙ) কিডনি ও লিভারের জটিলতা (কার্যক্ষমতা লোপ পাওয়া)

৩। তৃতীয় পর্যায়

ক) দেহের প্রান্তদেশীয় অঙ্গের পচন (গ্যাংগ্রিন)
খ) ত্বক, মূত্রথলি ও ফুসফুসের ক্যান্সার
গ) লিভারের কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ পাওয়া
ঘ) কিডনির কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ পাওয়া

বাংলাদেশে বেশিরভাগ রোগীদের প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ে রোগীদের আর্সেনিক দূষণমুক্ত পানি গ্রহণ করা বন্ধ করলে ও সহায়ক চিকিৎসা দিলে রোগীরা ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করে থাকে।

আর্সেনিকোসিস রোগীদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা

১। প্রস্রাব ২। নখ ৩। চুল ৪। চামড়া ৫। যকৃতের কোষকলা

২.৮ চিকিৎসা ও রোগ ব্যবস্থাপনা

ধীর বা ক্রনিক আর্সেনিকোসিস থেকে নিরাময় লাভের সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা পদ্ধতি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। দেখা গেছে, আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে যদি রোগী আর্সেনিক দূষিত পানি পান বন্ধ এবং নিরাপদ পানি গ্রহণ শুরু করে তাহলে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়। একই সঙ্গে যদি Chelation Therapy প্রয়োগ এবং রোগী ভিটামিন ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে রোগ নিরাময় দ্রুত হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে তা হলো, আর্সেনিক দূষণের ঘটনা জানামাত্র দূষিত পানি গ্রহণ বন্ধ করে দিতে হবে। আর্সেনিকোসিসের চিকিৎসা পদ্ধতি নিচে তুলে ধরা হলো।

চিলেশন থেরাপী (Chelation Therapy) ঃ সাম্প্রতিককালে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় এই থেরাপি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর ফলে রোগীর শরীরে আর্সেনিকজনিত বিষক্রিয়ার যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায় সেগুলোর খানিকটা উপশম হয়। শরীরে সঞ্চিত আর্সেনিকের পরিমাণ Chelation Therapy-এর মাধ্যমে হ্রাস পায় এবং এর ফলে আর্সেনিকজনিত ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। ক্রনিক আর্সেনিক বিষক্রিয়ার চিকিৎসায় এই থেরাপিতে Chelation Agent হিসেবে যে তিনটি ওষুধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছেঃ ডি-পেনিসিলামাইন, ডিএমএসএ বা ডাইমারকেপটো সাকসিনিক এসিড এবং ডিএমএসএ বা ডাইমারকেপটো প্রোপেন সালফোনেট। তবে এগুলো খুবই দামী ওষুধ। ফলে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশে আর্সেনিক আক্রান্ত সিংহভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে এসব ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা চালানো কার্যত সম্ভব নয়।

ডি-পেনিসিলামাইনের ক্ষেত্রে রোগীকে ২৫০ মিলিগ্রাম করে প্রতিদিন ৩-৪ বার এবং এভাবে তিনমাস ওষুধ খাওয়াতে হবে। তবে ২০-৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে শরীরে এই ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এসব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে জ্বর, থ্রমবোসাইটোপেনিয়া, লিউকোপেনিয়া, ক্ষুধামন্দা, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটা ইত্যাদি। ফলে যেসব রোগীকে ডি-পেনিসিলামাইন দেওয়া হয় তাদের উল্লিখিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো খুবই সর্তকভাবে মনিটর করার প্রয়োজন।

ডিএমএসএ- এর ক্ষেত্রে প্রথম সাতদিনের ডোজ হচ্ছে প্রতিদিন তিনবার করে রোগীর ওজনের প্রতি কেজির বিপরীতে ১০ মিলিগ্রাম পরবর্তী দু সপ্তাহে একই মাত্রা দিতে হবে দিনে দুবার করে। ডিএমপিএস দিতে হবে দিনে ৩-৪ বার করে ১০০ মিলিগ্রামের ডোজ।

পুষ্টিকর খাদ্য ও ভিটামিন

বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে, আর্সেনিক আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে খাদ্যের পুষ্টিমানের একটা সম্পর্ক আছে। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করলে শরীরে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং উপসর্গগুলোও কম দেখা যায়। উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার শরীরে মিথাইলেশন প্রক্রিয়া বাড়িয়ে দিয়ে অজৈব আর্সেনিককে শরীর থেকে দ্রুত বের করে দিতে

সাহায্য করে। এ, ই এবং সি– এই তিনটি ভিটামিন আর্সেনিকজনিত রোগ উপশমে সহায়তা করে থাকে। ভিটামিন সি আর্সেনিকের বিষাক্ততা কমিয়ে দেয়। আর ভিটামিন-এ-এর অভাব ঘটলে শরীরে আর্সেনিকের সেনসিটিভিটি বেড়ে যায়। আর্সেনিকোসিস ভিটামিন এ, ই, ও সি নিম্নলিখিত মাত্রায় প্রাপ্ত বয়স্ক রোগীদেরকে দেওয়া হয়-

ভিটামিন-	এ	দিনে ৫০,০০০ আই,ইউ
ভিটামিন-	ই	দিনে ২০০ মি.গ্রা.
ভিটামিন-	সি	দিনে ৫০০ মি.গ্রা.

আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের প্রোটিন এবং ভিটামিনজাত খাদ্য গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

আর্সেনিক আক্রান্ত ব্যক্তিদের এছাড়াও কিছু উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন– হাতে বা পায়ের তালুতে কেরাটোসিসের চিকিৎসায় কেরাটোলাইটিক মলম ব্যবহার করা। এর ফলে কেরাটোসিসের খানিকটা উন্নতি হয়। কেরাটোসিসের উপসর্গগুলো দূর করার জন্য প্রয়োজনে ক্রায়োসার্জারিও করা যেতে পারে।

সাবধানতাঃ

- **শরীরে আর্সেনিক দূষণের লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে তার পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;**
- **আর্সেনিকযুক্ত পানি পান বন্ধ করে নিরাপদ আর্সেনিক মুক্ত পানি পান করতে হবে;**
- **প্রোটিন ও ভিটামিন যুক্ত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে।**

২.৯ আর্সেনিক মুক্ত পানি পানে করণীয়

- পুকুর বা নদীর পানি বিশুদ্ধ করে পান করতে হবে। এজন্য এক কলসি (২০ লিটার) পানিতে আধা চামচ (১০ মিলিগ্রাম) ফিটকিরি মিশিয়ে ২-৩ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। ফিটকিরি মিশালে পানির ময়লা কলসির নিচে জমা হবে। সাবধানে পাত্রের উপরের পরিস্কার পানি অন্য পাত্রে ঢেলে ফুটিয়ে পান করতে হবে;
- বৃষ্টির পানি আর্সেনিকমুক্ত। তাই বৃষ্টি শুরু হওয়ার ৫ মিনিট পর পরিস্কার পাত্রে ধরে সেই পানি খাওয়া ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায়;
- আর্সেনিকযুক্ত পানি রান্না ও খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা যাবে না;
- আর্সেনিকযুক্ত পানি ফুটিয়ে খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে কারণ ফুটালে আর্সেনিক দূর হয় না বরং পানি শুকিয়ে গেলে তাতে আর্সেনিকের ঘনত্ব আরো বেরে যায়;
- টিউবওয়েল বসানোর আগে মাটির নিচের পানিতে আর্সেনিক মাত্রা পরীক্ষা করে দেখতে হবে;
- পুরানো টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে, টিউবওয়েল বসানোর আগে আশেপাশের টিউবওয়েলের পানি পরীক্ষা করতে হবে;
- টিউবওয়েল বসানোর পর, গোড়া বাঁধানোর আগে আর্সেনিক পরীক্ষা করাতে হবে;
- টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেলে টিউবওয়েলের মুখ লাল রং করতে হবে। পানিতে আর্সেনিক না থাকলে সবুজ রং করতে হবে। লাল রং দেখলে ঐ নলকূপের পানি খাওয়া যাবে না;
- আর্সেনিক দূষণমুক্ত টিউবওয়েলের পানি প্রতি ৬ মাস পরপর পরীক্ষা করাতে হবে। দেখতে হবে পানি আর্সেনিক দূষণমুক্ত আছে কি না;
- পাতকুয়ার পানিতে আর্সেনিক আছে কিনা পরীক্ষা করে পান করতে হবে।

২.১০ আর্সেনিক দূষণমুক্ত পানির উৎস

১. পরিশোধিত ভূ-পৃষ্ঠের পানি বা জলাধারের পানি (সারফেস ওয়াটার)
- পিএসএফ
- সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

২. বৃষ্টির পানি
- রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং

৩. গভীর নলকূপ

৪. উন্নত রিং ওয়েল

২.১১ ভূ-গর্ভস্থ আর্সেনিকযুক্ত পানি পরিশোধন প্রক্রিয়া

১. সাধারন বালুর ফিল্টার

২. ৩-কলসি পদ্ধতি

৩. সনো ফিল্টার

৪. আয়রন ক্লোরাইড কেমিকেল পদ্ধতি

৫. পাথর বালুর ফিল্টার নলকূপ বা আর্সেনিক রিমুভাল প্লান্ট

৬. সিডকো প্লান্ট

৭. এ্যালকান

৮. রিড এফ

বিষয়বস্তু-৩ ঃ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয়

উদ্দেশ্য	ঃ	এই বিষয়বস্তু আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বর্ণনা করতে/বলতে সক্ষম হবেন ঃ- ● পরীক্ষাগারে পানিতে আর্সেনিক নির্ণয়ের প্রক্রিয়া ● ফিল্ড কিটের মাধ্যমে পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয় ● পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয়ে সতর্কতা
সময়কাল	ঃ	২ ঘন্টা ৩০ মিনিট
উপকরণ	ঃ	আর্সেনিক যুক্ত পানি, HACH এবং Arsenic Econo-Quick™ আর্সেনিক ফিল্ড টেস্ট কিট হোয়াইটবোর্ড, হোয়াইটবোর্ড মার্কার, ফ্লিপ চার্ট বোর্ড, ফ্লিপ চার্ট পেপার, ফ্লিপ চার্ট মার্কার, সাদা কাগজ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ডাষ্টার, ম্যানুয়াল।

পরিচালন প্রক্রিয়াঃ

বিষয়		কার্যক্রম
বিষয়বস্তুর নাম ও উদ্দেশ্য	ঃ	বিষয়বস্তুর নাম লিখিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এই বিষয়বস্তু থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা কি শিখতে চায় তা প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিতে হবে । পূর্বে লিখিত নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ উপস্থাপন করতে হবে।
আলোচনা	ঃ	প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে। প্রশ্ন অংশগ্রহণকারীকে আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে । খেয়াল রাখতে হবে পদ্ধতিগতভাবে প্রশ্ন উপস্থাপন করা হচ্ছে কি না? অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু ফ্লিপ চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে।
বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ	ঃ	আলোচনা শেষে পুরো অধ্যায় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হবে।
মূল্যায়ন	ঃ	প্রশ্ন উপস্থাপন এবং উত্তর প্রদানের মধ্য দিয়ে অধ্যায়টি অংশগ্রহণকারীরা কতটুকু জেনেছে তা মূল্যায়ন করতে হবে।

৩.১ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয়

কিভাবে আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ করা হবে সেটা মূলত নির্ভর করে পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি সঠিকভাবে নির্ধারণের উপর।

আমাদের দেশে দুটি পদ্ধতিতে পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। যথা ঃ

১. স্পেকট্রোফটোমেট্রি পদ্ধতি

২. ফিল্ড কিট পদ্ধতি

প্রথমোক্ত পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয় বহুল, সময় সাপেক্ষ। এর জন্য অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরী প্রয়োজন তাই আমাদের দেশের সব টিউবওয়েলের পানি এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়।

এই অবস্থায় সহজলভ্য পদ্ধতিটি হচ্ছে ফিল্ড কিট পদ্ধতি।

ল্যাবরেটরী ও ফিল্ড কিটস্ পদ্ধতির তুলনা [১]

ল্যাবরেটরী পদ্ধতি	ফিল্ড কিট পদ্ধতি
ব্যয় বহুল পদ্ধতি।	কম খরচ সাপেক্ষ।
পদ্ধতিটি জটিল ও সময় সাপেক্ষ।	অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতি ও কম সময়ে করা হয়।
পরীক্ষণীয় পানির প্রাক-প্রক্রিয়াকরণ প্রয়োজন।	পরীক্ষণীয় পানি সরাসরি পরীক্ষা করা যায়।
দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী প্রয়োজন।	সহজেই প্রশিক্ষণ দেয়া যায়।
পরীক্ষণীয় পানিতে প্রাক-প্রক্রিয়াকরণ করে ল্যাবরেটরীতে আনতে হয়।	মাঠ পর্যায়ে পানি পরীক্ষা করে সাথে সাথে ফলাফল পাওয়া যায়।
আর্সেনিকের সঠিক মাত্রা নিরূপণ করা যায়।	আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।
ফলাফলের বিশ্বাস যোগ্যতা অনেক বেশী।	ফলাফলের বিশ্বাস যোগ্যতা অপেক্ষকৃত কম।

৩.২ পরীক্ষাগারে পানিতে আর্সেনিক নির্ণয়ের আদর্শ প্রক্রিয়া

পানীয় জলে দ্রবীভূত পুনরুদ্ধারযোগ্য আর্সেনিক নির্ণয়ে Spectophotometry (স্পেক্টোফটোমেট্রি) ও Atomic absorbtion spectophotometry (এটোমিক এবজরপ্শন স্পেক্টোফটোমেট্রি) -এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলো খুবই কার্যকরী। কিছু কিছু জৈব আর্সেনিক যৌগ যেমন, ফিনাইল আর্সেনিক এসিড, ডাইসোডিয়াম মিথেন আরর্সেনেট এবং ডাইমিথাইল আরর্সেনিক এসিড ইত্যাদি প্রক্রিয়ার (digestion) সময় সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার করা যায় না। নিম্নলিখিত পরীক্ষাসমূহ সাধারণত পরীক্ষাগারে হয়ে থাকে।

পরীক্ষণ প্রক্রিয়া (ক)	সিলভার ডাই-ইথাইল ডাইথিও কারবামেট কলোরিমেট্রিক (Silver Diethyldithio Carbamate Colorimetric)	প্রতিলিটারে ঘনত্ব ৫ থেকে ২৫০ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত
পরীক্ষণ প্রক্রিয়া (খ)	এটোমিক এবজরপ্শন হাইড্রাইড জেনারেশন (Atomic absorption Hydride Generation)	প্রতিলিটারে ঘনত্ব ১ থেকে ২০ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত
পরীক্ষণ প্রক্রিয়া (গ)	এটোমিক এবজরপ্শন গ্রাফাইট ফারনেস (Atomic absorption Graphite Furnace)	প্রতিলিটারে ঘনত্ব ৫ থেকে ১০০ইক্রোগ্রাম পর্যন্ত

৩.৩ ফিল্ড কিটের মাধ্যমে পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয়

বর্তমানে বাজারে যে সব কিটস্ পাওয়া যায় তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের HACH কোম্পানীর তৈরী কিট এবং Industrial Test Systems কোম্পানীর তৈরী Arsenic Econo-Quick™ কিট বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩.৩.১ HACH আর্সেনিক ফিল্ড টেস্ট কিটের মাধ্যমে আর্সেনিকের মাত্রা নির্ণয় [১১]

HACH কিটসের বিভিন্ন অংশ

১. ১০০টি ব্রোমাইড পেপারযুক্ত স্ট্রিপসহ একটি বোতল
২. ২টি ছিপিযুক্ত রিএ্যাকশান ভেসেল
৩. ১টি পরিমাপক চামচ
৪. আর্সেনিক রিএজেন্ট ১নং - ৫নং
৫. স্ট্রিপ বোতলের গায়ে লাগানো কালার চার্টের
৬. পরীক্ষণ নির্দেশিকা

চিত্র - ১ ঃ HACH আর্সেনিক ফিল্ড টেস্ট কিটের বিভিন্ন অংশ

পরীক্ষার নিয়ম

পরীক্ষা শুরু করার পূর্বে ব্রোমাইড পেপার যুক্ত স্ট্রিপটি রিএ্যাকশান ভেসেলের ছিপিতে এমন ভাবে স্থাপন করতে হবে যেন ব্রোমাইড পেপার যুক্ত অংশটি ভেসেলের মাঝামাঝি স্থানে থাকে।

১. ভেসেলের ছিপিতে টেস্ট স্ট্রিপ স্থাপন করতে হবে

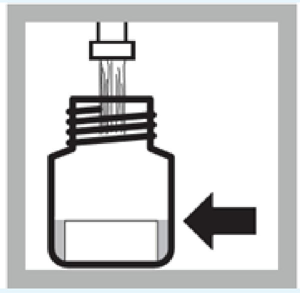

২. রিঅ্যাকশান ভেসেলের ৫০ মি.লি. দাগ পর্যন্ত পানির স্যাম্পেল সংগ্রহ করতে হবে

৩. রিঅ্যাকশান ভেসেলে রিএজেন্ট-১ এর ১টি মোড়কের সবটুকু পাউডার ঢালতে হবে এবং ভেসেল ঘুরিয়ে পাউডার পানিতে দ্রবীভূত করতে হবে

৪. রিঅ্যাকশান ভেসেলে রিএজেন্ট-২ এর ১টি মোড়কের সবটুকু পাউডার ঢালতে হবে এবং ভেসেল ঘুরিয়ে পাউডার পানিতে দ্রবীভূত করতে হবে

৫. তিন মিনিট অপেক্ষা করতে হবে

৬. রিঅ্যাকশান ভেসেলে রিএজেন্ট-৩ এর ১টি মোড়কের সবটুকু পাউডার ঢালতে হবে এবং ভেসেল ঘুরিয়ে পাউডার পানিতে মিশ্রিত করতে হবে

৭. দুই মিনিট অপেক্ষা করতে হবে এবং ভেসেল ঘুরিয়ে মিশ্রিত করতে হবে

৮. রিঅ্যাকশান ভেসেলে এক চামচ পরিমান রিএজেন্ট-৪ ঢালতে হবে এবং ভেসেল ঘুরিয়ে পানিতে মিশ্রিত করতে হবে

৯. রিঅ্যাকশান ভেসেলে রিএজেন্ট-৫ এর ১টি মোড়কের সবটুকু পাউডার ঢালতে হবে

১০. তৎক্ষণাৎ ভেসেলে টেস্ট স্ট্রিপসহ ছিপি লাগাতে হবে। ভেসেল নাড়ান না উল্টান যাবেনা।

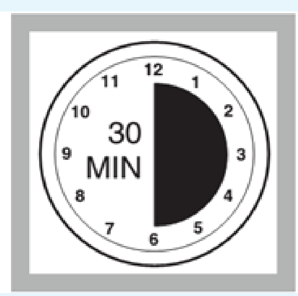

১১. ভেসেল ২ বার ঘুরিয়ে ত্রিশ মিনিট বিক্রিয়ার জন্য রেখে দিতে হবে।

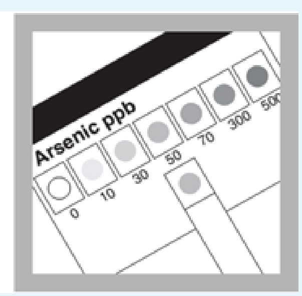

১২. ছিপি থেকে স্ট্রিপ সরিয়ে স্ট্রিপ বোতলের কালার চার্টের সাথে পরীক্ষা স্ট্রিপের কালার মিলিয়ে আর্সেনিকের মাত্রা নির্ণয় করতে হবে।

উল্লেখ্য, পানিতে আর্সেনিক দূষণ না থাকলে স্ট্রিপের ব্রোমাইড পেপারের কোন রং দেখা যাবে না। ভাল ফলাফলের জন্য স্ট্রিপের রিডিং বাইরে ছায়াযুক্ত আলোকময় স্থানে নিতে হবে। তবে সরাসরি রৌদ্রে স্ট্রিপের কালার পরিবর্তিত হয়ে যায়।

একটি HACH আর্সেনিক ফিল্ড টেস্ট কিট বক্সের মাধ্যমে ১০০টি পানির স্যাম্পেলের আর্সেনিক পরীক্ষা করা যায়। কালার কমপারেটরের ধাপসমূহ যথাক্রমে ০, ১০, ৩০, ৫০, ৭০, ৩০০, ৫০০ পিপিবি (পার্টস পার বিলিয়ন) বা ০ ০.০১, ০.০৩, ০.০৫, ০.০৭, ০.৩, ০.৫ মি.গ্রা./লি.।

৩.৩.২ Arsenic Econo-Quick ™ ফিল্ড টেস্ট কিটের মাধ্যমে আর্সেনিকের মাত্রা নির্ণয় [১২]

Arsenic Econo-Quick™ ফিল্ড টেস্ট কিটের বিভিন্ন অংশ

১. ১০০টি ব্রোমাইড পেপারযুক্ত স্ট্রিপ
২. ২টি নীল টারিটযুক্ত ছিপি
৩. ২টি কাল ছিপিযুক্ত রিএ্যাকশান বোতল
৪. ৩টি পরিমাপক চামচ
৫. আর্সেনিক রিএজেন্ট ১নং - ৩নং
৬. কালার চার্ট
৭. পরীক্ষণ নির্দেশিকা

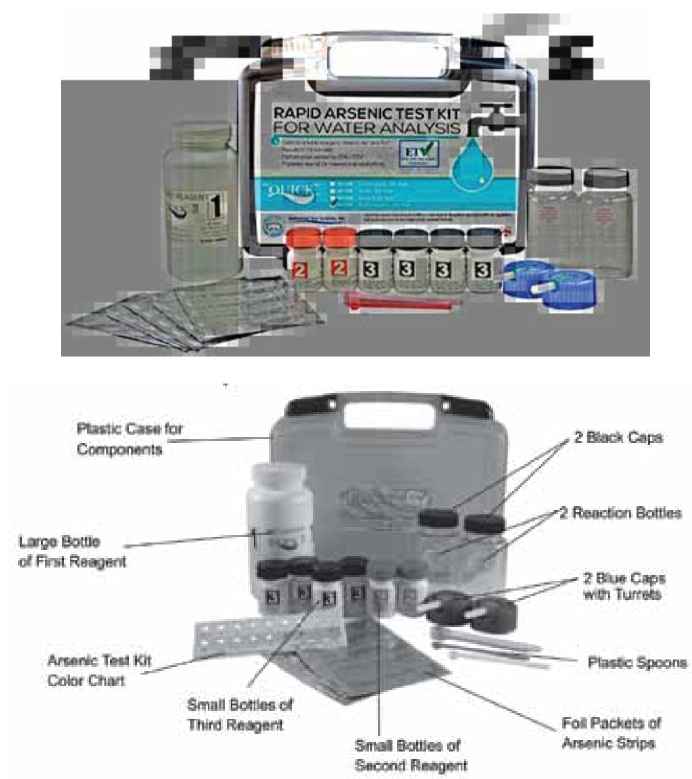

চিত্র - ২ : Arsenic Econo-Quick ™ ফিল্ড টেস্ট কিটের বিভিন্ন অংশ

পরীক্ষার নিয়ম

১. পরীক্ষার শুরুতে রিএ্যাকশান বোতলের ৫০ মি.লি. দাগ পর্যন্ত ধীরে ধীরে পানির স্যাম্পেল সংগ্রহ করতে হবে
২. রিএ্যাকশান বোতলে গোলাপী চামচের দুই চামচ পরিমান রিএজেন্ট-১ ঢালতে হবে এবং সাবধানে কালো ছিপি লাগিয়ে রিএ্যাকশান বোতল ১৫ সেকেন্ড প্রবলভাবে ঝাঁকাতে হবে।
৩. রিএ্যাকশান বোতলের ছিপি খুলে লাল চামচের ২ চামচ পরিমান রিএজেন্ট-২ যোগ করতে হবে এবং পুনরায় কালো ছিপি লাগিয়ে রিএ্যাকশান বোতল ১৫ সেকেন্ড প্রবলভাবে ঝাঁকাতে হবে।
৪. বোতলে বিক্রিয়ার জন্য ২ মিনিট রেখে দিতে হবে। এ সময়ে ব্রোমাইড পেপার যুক্ত স্ট্রিপটি নিচের চিত্রের মত নীল ছিপির টারিটে এমন ভাবে স্থাপন করতে হবে যেন ব্রোমাইড পেপার যুক্ত অংশটি ভেসেলের মাঝামাঝি স্থানে থাকে।

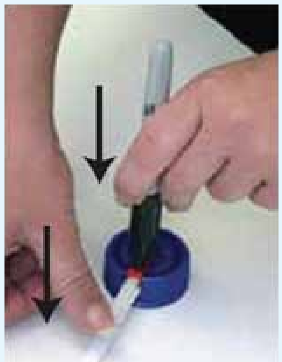

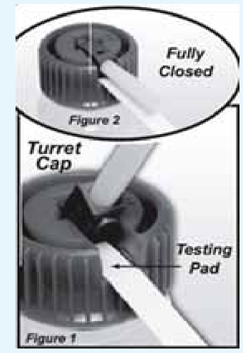

নীল ছিপি এবং টারিট উভয়ই শুষ্ক থাকতে হবে। প্যাকেট থেকে স্ট্রিপ সাবধানে বের করতে হবে এবং স্ট্রিপের ব্রোমাইডযুক্ত প্যাড স্পর্শ করা যাবেনা।

১. রিএ্যাকশান বোতলের ছিপি খুলে সাদা চামচের ২ চামচ পরিমান রিএজেন্ট-৩ যোগ করতে হবে এবং পুনরায় কালো ছিপি লাগিয়ে রিএ্যাকশান বোতল ৫ সেকেন্ড প্রবলভাবে ঝাকাতে হবে।
২. অতঃপর রিএ্যাকশান বোতলের ছিপি খুলে নীল টারিটযুক্ত ছিপি লাগিয়ে রিএ্যাকশান বোতলে বিক্রিয়ার জন্য ১০ মিনিট রেখে দিতে হবে (কখনই ১২ মিনিটের বেশি নয়)।
৩. নীল টারিটযুক্ত ছিপি থেকে স্ট্রিপ সরিয়ে কালার চার্টের সাথে পরীক্ষা স্ট্রিপের ব্রোমাইড প্যাডে দৃশ্যমান কালার মিলিয়ে আর্সেনিকের মাত্রা ২ মিনিটের মধ্যে নির্ণয় করতে হবে।
৪. অতঃপর ব্যবহৃত স্ট্রিপটি ফয়েল প্যাকেটে রেখে প্যাকেট আটকে দিতে হবে।

উল্লেখ্য, পানিতে আর্সেনিক দূষণ না থাকলে স্ট্রিপের ব্রোমাইড পেপারের কোন রং দেখা যাবে না। ভাল ফলাফলের জন্য স্ট্রিপের রিডিং বাইরে ছায়াযুক্ত আলোকময় স্থানে নিতে হবে। তবে সরাসরি রৌদ্রে স্ট্রিপের কালার পরিবর্তিত হয়ে যায়।

একটি Arsenic Econo-Quick ™ ফিল্ড টেস্ট কিট বক্সের মাধ্যমে ১০০টি পানির স্যাম্পেলের আর্সেনিক পরীক্ষা করা যায়। কালার কমপারেটরের ধাপসমূহ যথাক্রমে ০, ০.০১০, ০.০২৫, ০.০৫০, ০.১, ০.২, ০.৩, ০.৫, ১.০ পিপিএম বা মি.গ্রা./লি.।

৩.৪ ফিল্ড কিটের মাধ্যমে পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয়ে সতর্কতা

- প্রথমেই ফিল্ড কিটের **"expiry date"** দেখে নিতে হবে এবং উক্ত তারিখ পর্যন্ত কিট বক্সটি ব্যবহার করা যাবে।
- উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করে যত দ্রুত সম্ভব পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। কখনও পানি সংগ্রহ করে দূরে কোথাও নিয়ে বা দীর্ঘক্ষণ পরে পরীক্ষা করা যাবেনা।
- প্যাকেট থেকে স্ট্রিপ সাবধানে বের করতে হবে এবং স্ট্রিপের ব্রোমাইডযুক্ত প্যাড স্পর্শ করা যাবেনা।
- চামচের মাধ্যমে রিএজেন্ট যোগ করার পর বোতলটির মুখ ভালভাবে আটকাতে হবে। বেশি সময় খোলা অবস্থায় রেখে দিলে রি-এজেন্ট বাতাসের সংস্পর্শে কার্যকারীতা হারাতে পারে।
- পরীক্ষা স্ট্রিপের ব্রোমাইড প্যাডে দৃশ্যমান কালার মিলিয়ে আর্সেনিকের মাত্রা ২ মিনিটের মধ্যে নির্ণয় করতে হবে। বেশি সময় নিলে স্ট্রিপের কালার পরিবর্তিত হয় এবং এতে আর্সেনিকের প্রকৃত মাত্রা পাওয়া যাবেনা।
- স্ট্রিপের রিডিং বাইরে ছায়াযুক্ত আলোকময় স্থানে নিতে হবে। তবে সরাসরি রৌদ্রে স্ট্রিপের কালার পরিবর্তিত হয়ে যায়।
- ব্যবহৃত স্ট্রিপটি ফয়েল প্যাকেটে রেখে প্যাকেট আটকে দিতে হবে।
- প্রতিবার ব্যবহারের পর রিএ্যাকশান বোতল পরিষ্কার করে টিস্যু বা শুকনা কাপড় দিয়ে মুছে রাখতে হবে।

বিষয়বস্তু-৪ ঃ আর্সেনিক দূষণ ও এর প্রতিরোধ সম্পর্কে গণসচেতনতা, যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণ

উদ্দেশ্য	ঃ	এই বিষয়বস্তু আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বর্ণনা করতে/বলতে সক্ষম হবেন ঃ- ● গণসচেতনতা, যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণ বলতে কি বোঝায়। ● যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা, যোগাযোগের মাধ্যম এবং উদ্বুদ্ধকরণের উপায়সমূহ।
সময়কাল	ঃ	২০ মিনিট
উপকরণ	ঃ	হোয়াইট বোর্ড, হোয়াইটবোর্ড মার্কার, ফ্লিপ চার্ট বোর্ড, ফ্লিপ চার্ট পেপার, ফ্লিপ চার্ট মার্কার, সাদা কাগজ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ডাষ্টার, ম্যানুয়াল।

পরিচালন প্রক্রিয়া ঃ

বিষয়		কার্যক্রম
বিষয়বস্তুর নাম ও উদ্দেশ্য	ঃ	বিষয়বস্তুর নাম লিখিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এই বিষয়বস্তু থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা কি শিখতে চায় তা প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিতে হবে । পূর্বে লিখিত নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ উপস্থাপন করতে হবে।
আলোচনা	ঃ	প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে। প্রশ্ন অংশগ্রহণকারীকে আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে । খেয়াল রাখতে হবে পদ্ধতিগতভাবে প্রশ্ন উপস্থাপন করা হচ্ছে কি না? অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু ফ্লিপ চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে।
বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ	ঃ	আলোচনা শেষে পুরো অধ্যায় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হবে।
মূল্যায়ন	ঃ	প্রশ্ন উপস্থাপন এবং উত্তর প্রদানের মধ্য দিয়ে অধ্যায়টি অংশগ্রহণকারীরা কতটুকু জেনেছে তা মূল্যায়ন করতে হবে।

৪.১ আর্সেনিক দূষণ ও এর প্রতিরোধ সম্পর্কে গণসচেতনতা, যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণ

আর্সেনিক সমস্যা আমাদের দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা। আর্সেনিক কোন ছোঁয়াচে রোগ নয়। এর প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করা জরুরী। পানীয় জলকে আর্সেনিকমুক্ত করতে হলে জনগণকে অবশ্যই সচেতন করতে হবে। এ জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে আর্সেনিক সম্পর্কে জনগণকে সচেতনতা প্রদানের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে জনগণের সাথে সংযোগসাধন করতে হবে এবং আর্সেনিক মুক্ত পানি পানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৪.২ গণসচেতনতা

কোন বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের মাধ্যমে জনগোষ্ঠির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারার ক্ষমতাকে গণসচেতনতা বলে। জনগণকে সঠিক তথ্য সহজভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে জনগণ তা সহজে গ্রহণ করতে পারে। এরজন্য একই বিষয়কে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

৪.৩ যোগাযোগ

যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষ নতুন জ্ঞানের সন্ধান পায় এবং তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তিত মনোভাবের কারণে সঠিক সময়ে সে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয় তখনই যখন কোন তথ্য বা বক্তব্য প্রদান করা হয়, তা শ্রোতা দ্বারা গৃহীত হয় এবং শ্রোতা সে সম্পর্কে মতামত প্রদান করে। ব্যক্তি-ব্যক্তির আলোচনা, দলবদ্ধ আলোচনা, গ্রুপের মধ্যে বক্তৃতা কিংবা রেডিও, টেলিভিশন বা খবরের কাগজের মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায়।

যোগাযোগের ফলাফলই প্রধান। যদি যোগাযোগের ফলে যাদের জন্য যোগাযোগ তারা সে তথ্য গ্রহণ করে, বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী ব্যবহারিক পরিবর্তন ঘটায় তাহলে সেটি সফল যোগাযোগ হিসাবে গণ্য হবে। যোগাযোগের জন্য তিনটি বিষয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঃ

- কোথায় জনগণকে পাওয়া যাবে
- কখন তাদের পাওয়া যাবে
- কিভাবে তাদের সম্পৃক্ত করা যাবে।

যোগাযোগের নানাবিধ মাধ্যম রয়েছে। আর্সেনিক সমস্যা আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে ছোট দলের মধ্যে বক্তৃতা প্রদানই সবচাইতে গ্রহণযোগ্য মাধ্যম। এছাড়া পোস্টার, লিফলেট, দেশীয় জারী গান, নাটক আর্সেনিক সমস্যা ও তার জন্য করণীয় প্রচারে ভাল যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমেও যোগাযোগ সম্পন্ন করা যায়। নিম্নে বক্তৃতা (Talk) এর বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করা হলোঃ

সবচাইতে অকৃত্রিম যোগাযোগের মাধ্যম হলো বক্তৃতা বা কথা বলা (Talk)। এর মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার এবং গ্রুপ পর্যায়ে যোগাযোগ করা যায়। বক্তৃতা ও ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা একটি প্রাণবন্ত যোগাযোগ সৃষ্টি করে। একতরফা বক্তৃতাকে শুধু উপদেশ মনে হবে এবং জনগণ সব সময় উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না।

বক্তৃতার সময় নানা ধরনের প্রশিক্ষণ উপকরণ যেমন ছবি, ফ্লিপ চার্ট, পোস্টার ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। স্থানীয় ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করলে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

বক্তৃতার দেওয়ার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন

১. পূর্বে জানতে হবে তাদের আগ্রহ ও চাহিদা কি?
২. চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করতে হবে। সহজ ভাষায় ও একটি বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দেয়া ভালো। বড় বিষয় হলে বিষয়টি ভেঙ্গে দু/তিনটি ভাগে ভাগ করে আলাদা আলাদা সময়ে বক্তৃতা প্রদান করা যেতে পারে।
৩. বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও সর্বশেষ তথ্য জানা থাকতে হবে।
৪. বক্তৃতার সময় নির্দিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য দিকগুলোকে উপস্থাপন করতে হবে। বেশী বললে মানুষ অনেক কিছু ভুলে যেতে পারে।
৫. যা বলা হবে তার সূচক দিকগুলো লিখে নিলে ভালো হয়। তাতে পুরো বিষয়টি উপস্থাপনের সময় কোন প্রয়োজনীয় অংশ বাদ যাবে না।
৬. বক্তৃতার সহায়ক হিসাবে কোন টিচিং এইড (চক বোর্ড, কাগজ-কলম, ফ্লিপ চার্ট,ও এইচ পি বা স্লাইড প্রজেক্টর, ইত্যাদি) ব্যবহার করা হবে তা ঠিক করতে হবে এবং বক্তৃতার সময় তার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. নিজে বক্তৃতাটি রিহার্সেল দিয়ে নিলে ভাল হয়।
৮. বক্তৃতার সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বক্তৃতা শেষ করতে হবে।
৯. বক্তৃতার স্থান নির্বাচন করে রাখতে হবে। কোলাহল মুক্ত পরিবেশ বক্তৃতার জন্য উপযুক্ত।
১০. যে সময় শ্রোতা বেশী পাওয়া যাবে বা তাদের সুবিধামত সময়ে বক্তৃতার আয়োজন করতে হবে।

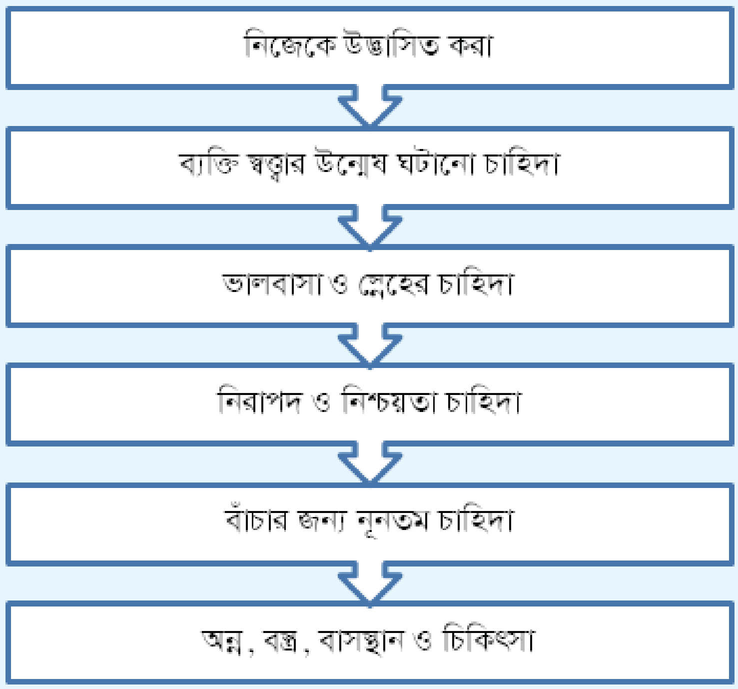

চাহিদার স্তরসমূহ

৪.৪ উদ্বুদ্ধকরণ

প্রখ্যাত দার্শনিক মনোবিজ্ঞানিক আব্রাহাম মসএলা-এর মতে নিম্ন অংকিত মানুষের চাহিদা স্তরগুলোর সঠিক পূরণের মাধ্যমে পরবর্তী উত্তোরণ ঘটলে যে কোন মানুষ নিজেকে উদ্ভাসিত করার স্তরে পৌছাতে পারে।

উদ্ভাসিত ব্যক্তিকে যেকোন কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়। এছাড়া আরো বিভিন্ন ভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যায়। যেমন,

১. ইনসেনটিভ বা পুরষ্কার প্রদান ঃ পুরষ্কার প্রদানের মাধ্যমে যে কোন মানুষকে কোন কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করানো যায়। তবে সেটি সাময়িক। ইনসেনটিভ বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ তার পূর্বের স্থানে ফিরে আসে।

১. চিহ্নিতকরণ বা আইডেনটিফিকেশন ঃ নিজেকে ক্ষমতবান বা আর্কষণীয় কারো মত করে চিহ্নিত করার জন্য মানুষ সেই ব্যক্তির ন্যায় কার্যাদি করতে উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু আলোচ্য ব্যক্তির পরিবর্তন ঘটলে তার কার্যাবলীও বন্ধ হয়ে যায়।

২. আত্মস্থংকরণ বা ইনটারনালাইজেশন ঃ কোন পরিবর্তন বা জ্ঞানকে সঠিকভাবে বুঝে আত্মস্থ করলে তারমধ্যে পরিবর্তন ঘটে ও বিষয়গুলোকে নিজে বিশ্বাস করে এবং ঐ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এই পরিবর্তন স্থায়ী।

1 আর্সেনিক দূষণ নিরসন কার্যক্রম, ট্রেনিং ম্যানুয়াল, ১৯৯৮, আর্সেনিক দূষণ নিরসন কার্যক্রম প্রকল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

2 Progotir Pathey, 2015, Multiple Indicator Cluster Survey 2012-2013, Final Report, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and United Nations Children’s Fund (UNICEF), March, 2015.

3 Situation Analysis of Arsenic Mitigation 2009, 2010, JICA/DPHE.

4 HEALTH BULLETIN, 2016, Management Information System Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare.

5 G. Schneier-Madanes, M.-F. Courel (eds.), Water and Sustainability in Arid Regions, DOI 10.1007/978-90-481-2776-4_17, C Springer Science+Business Media B.V. 2010

6 Sancha AM, O'Ryan R., 2008, Managing hazardous pollutants in Chile: arsenic., Rev Environ Contam Toxicol. 2008;196:123-46.

7 Ching-Ping Liang, Yi-Chi Chien, Cheng-Shin Jang, Ching-Fang Chen and Jui-Sheng Chen, 2017, Spatial Analysis of Human Health Risk Due to Arsenic Exposure through Drinking Groundwater in Taiwan’s Pingtung Plain, Int. J. Environ. Res. Public Health 2017, 14, 81; doi:10.3390/ijerph14010081

8 Luis Rodríguez-Lado, Guifan Sun, Michael Berg, Qiang Zhang, Hanbin Xue, Quanmei Zheng and C. Annette Johnson, 2013, Groundwater Arsenic Contamination Throughout China, *Science* 23 Aug 2013: Vol. 341, Issue 6148, pp. 866-868, DOI: 10.1126/science.1237484

9 M. N. Majumdar, 2006, “Banglay Arsenic: Prokiti O Pratikar”, Retrived from: http://hindi.indiawaterportal.org/node/54263, Date of access: 12/07/2017.

10 P. Ravenscroft, J.M. McArthur and B.A. Hoque, 2001, "Geochemical and Palaeohydrological Controls on Pollution of Groundwater by Arsenic" In: Arsenic Exposure and Health Effects IV. W.R. Chappell, C.O. Abernathy & R. Calderon (Eds), p 53-78, Elsevier Science Ltd. Oxford.

11 Hach 28000 Manual, HACH Company, USA.

12 Instruction Booklet, Industrial Test Systems, Inc.1875 Langston Street, Rock Hill, SC 29730 USA

D P H E

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর